Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থানের বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জহুরা খানম

রোলঃ 227020527

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থানের বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জহুরা খানম

রোলঃ 227020527

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থানের বিধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জহুরা খানম, আইডিঃ 227020527 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ----------- ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Johura Khanom

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জহুরা খানম

আইডিঃ 227020527

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

সূচিপত্র

- **ভূমিকা**
- **আল্লাহ মনোনিত ধর্ম**
- **অমুসলিম দেশে মুসলমানদের বসবাসের বিধান**

অমুসলিম দেশে বসবাস নাজায়িযের দলিল

অমুসলিম দেশে বসবাস জায়িযের দলিল

- **অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান ও বসবাসের শর্ত**

অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য প্রধান শর্ত

অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকার

- **অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানের কারণ ও বৈধ প্রকার**

দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে সফর ও অবস্থান

ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসবাস

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অবস্থান

পড়াশোনার জন্য অবস্থান

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অবস্থান

কাফিরদের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য অবস্থান

- **অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ ও স্থায়ীভাবে বসবাস করার বিধান**

রাজনৈতিক নিরাপত্তা অর্জন

জীবিকা নির্বাহের সন্ধানে

দা'ওয়াত ও তাবলীগ

ভোগ-বিলাস ও উন্নত জীবন যাপনের লক্ষ্যে

মুসলমানের ওপর নিজের বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে

- **ইসলাম ও ভ্রমণ**

অমুসলিম দেশে ভ্রমণ

- **হালাল খাবার**

হালাল খাবার ও মুসলমানদের করনীয়
সুপারশপ থেকে মাংস কিনে খাওয়া

- **ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি**

সংস্কৃতির পরিচয়
ইসলামি সংস্কৃতি
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি
মুসলিম-অমুসলিমের সহাবস্থানের বিধান
অমুসলিমদের দেয়া সাধারণ খাবার ও উপহার
অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান
মুসলমানদের অনুষ্ঠানে অমুসলিমদের অংশগ্রহণ
অমুসলিমদের সালাম দেয়ার বিধান
অমুসলিম ব্যক্তির হাঁচির বিধান
মসজিদ নির্মাণ কাজে অমুসলিমদের সহযোগিতা
অমুসলিমকে দিয়ে মসজিদ নির্মাণ
অমুসলিমদের সাথে আচরণে ইসলামের নির্দেশনা

- **পর্দা**

নারীর মুখমণ্ডলসহ পূর্ণ পর্দা
পুরুষের পর্দা
মাহরাম ও গায়রে মাহরাম কারা
মুসলমানের পোশাক
পোশাকের কিছু মৌলিক নীতিমালা
হে পথিক

- **নামাজ**

- **সন্তান পালন ও দ্বীনি তারবিয়ত**

অমুসলিম দেশে সন্তান
সঠিক তারবিয়তের অভাব
আমাদের কর্তব্য ও করনীয়

- **ইসলামি সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা**

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ
ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম
পাশ্চাত্যে লাগামহীন যৌন স্বাধীনতা ও ইসলাম
অশ্লীলতা ও ইসলাম

- **আল ওয়ালা ওয়াল বারা**

কাফিরদের সাথে আল বারা এবং উত্তম আচরণ
কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যতা

- **অমুসলিম দেশে বসবাস**

অমুসলিম দেশে যারা বড় হয়
আমেরিকার এক মসজিদের ঘটনা
গায়েবী সাহায্য
এক তাবলীগ জামাতের ঘটনা
কাফেরদের ধোঁকা
জনৈক মুসলিম ছাত্রের ঘটনা
এক ডাক্তারী পড়ুয়া ছাত্রের জিজ্ঞাসা
জনৈক অফিসারের সাক্ষাৎকার
কোথায় পালাচ্ছ তুমি?

- **সেক্যুলারিজম এর ধর্মীয় স্বাধীনতা**

সেক্যুলারিজম
আমেরিকায় শয়তান পূজারিদের অধিকার
সেক্যুলারিজম এর ধর্মীয় স্বাধীনতা

- **একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার জবাব**
- **অমুসলিম দেশে মুসলিম পরিচয় রক্ষা**
- **উপসংহার**
- **সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি**

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ -র জন্য। যিনি আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। আর অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবিজি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর শানে। তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবিগণের ওপর।

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
[الروم: 30]

অর্থঃ সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দীনের অভিমুখী রাখ। আল্লাহর সেই ফিতরত অনুযায়ী চল, যে ফিতরতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। এটাই সম্পূর্ণ সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون
[الذاريات: 56]

অর্থঃ আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। [সূরা যারিয়াত: 56]

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাত কর, আমি তোমার বক্ষকে ঐশ্বর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী করব। আর যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে আমি তোমার বক্ষকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করব এবং অন্যের প্রতি তোমার নির্ভরশীলতাও কখনও বন্ধ করবনা।' (আহমাদ ২/৩৫৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইবন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৭/১৬৬, ইবনে মাজাহ ২/১৩৭৬)

ইসলাম ফিতরাতের দীন,সহজাত স্বভাব ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরকালকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুসলিম জাতিরা। সবচেয়ে বেশি মানুষ বাইরে থাকেন এমন দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। বর্তমানে আমাদের প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ছড়িয়ে রয়েছেন দুনিয়ার নানা দেশে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো ছাড়াও আমাদের বাংলাদেশি ভাইবোনদের বড় একটি অংশ বাস করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি অমুসলিম দেশে।

মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অমুসলিম প্রধান দেশগুলোতে বসবাস করেন। বর্তমান যুগের আগে এত ব্যাপকভাবে অমুসলিম দেশে মুসলমানদের বসবাস করার চল ছিল না। পাশাপাশি আগে খেলাফত ও শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র থাকায় মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার বিষয়ে অনিশ্চয়তাও কম ছিল। উপনিবেশবাদের প্রেক্ষিতে অনেক মুসলিম দেশ বা অঞ্চল যেমন স্বাধীনতা হারিয়েছে, তেমনি পরবর্তীতে অনেক মুসলমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে নিজ দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

এই শেষ দুই কারণকেও আমরা উপনিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। উপনিবেশ মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করেছে। ব্যাহত করেছে সামাজিক স্থিতিশীলতা। ফলে অর্থনৈতিক ভাগ্যউন্নয়নে পশ্চিমা দেশগুলোতে পাড়ি জমাতে থাকেন মুসলমানরা। পাশাপাশি রাজনৈতিক অসম মেরুকরণে অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোতে নাগরিকরা রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। মিসর, সিরিয়া, ইরাক, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে নিরাপদ জীবনের লক্ষ্যে শিক্ষিত তরুণরা আমেরিকা ও ইউরোপে পাড়ি জমাতে থাকেন। পাশাপাশি জন্মহারে এগিয়ে থাকায় অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন-শাসিত মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রবলভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।
সর্বোপরি মুসলিম দেশগুলোতে সেকুলার শাসনে নিরাপত্তা, অধিকার ও জীবিকার প্রশ্নে শিক্ষিত তরুণদের অনেকে বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হন। এখানে বলে রাখা ভালো, সৌদি, কাতার বা তুরস্কের মতো উন্নত মুসলিম দেশগুলোতে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ অনেক সীমিত বা অসম্ভব। ফলে সেখানে অনেকে জীবিকার জন্য গেলেও বসবাসের জন্য স্থায়ীবাসের সুযোগ পান না। এভাবে অমুসলিম দেশগুলোতে বিপুল পরিমাণ মুসলমানদের আবাস গড়ে উঠেছে।

তাছাড়া আজকাল নানা কারণে প্রতিনিয়ত দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলোর বহু মুসলমান নাগরিক বিভিন্ন অমুসলিম দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন এবং সেখানে থিতু হয়ে যাচ্ছেন। ভাবসাব দেখে মনে হয় ওসব দেশে তাঁরা বেশ সুখেই আছেন। নিজেদের অবস্থা ও জীবনযাত্রার ওপর তাঁরা সন্তুষ্ট। কেননা যাঁরা একবার যান, তাঁদের মধ্যে নিজেদের দেশে ফেরার ইচ্ছে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু চিন্তার কথা হলো, অমুসলিম দেশের অনৈসলামিক পরিবেশে কীভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন তাঁরা? ইসলাম একে কীভাবে দেখে? নিজেদের ইমান রক্ষা ও দীন পালনে তাঁদের কী ধরনের জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়? এসব জটিলতা কাটিয়ে ওঠার উপায় কী? ইসলামি জীবনদর্শনের আলোকে এ নিয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া সময়ের দাবি।

ইসলামের দাবি হলো, মুসলিমরা সারা জীবন স্বাধীনভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর অনুসরণে জীবনযাপন করবেন। কিন্তু পরিবেশ ও প্রতিবেশ সবসময় সেই সুযোগ দেয় না। বিশেষত যেসব মুসলমান নানা অমুসলিম দেশে বসবাস করেন, তাঁরা নিজেদের ধর্মপালনে প্রায়শই বিভিন্ন জটিলতার মুখোমুখি হন। কখনো কখনো এসব জটিলতা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না। তখন তাঁরা নিজেদেরকে বড় অসহায় ও বিপন্ন মনে করেন।

এমন সঙ্কটে ইসলাম কী করতে বলে? একই সঙ্গে গুনাহ ও অপরাধবোধ থেকে বাঁচার কি কোনো পথ আছে?

ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন জীবনব্যবস্থা, কাজেই এ বিষয়েও তার দিক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্য ও দাওয়ার উদ্দেশ্যে নগণ্য এই ত্বলিবুল ইলমের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ ﷻ আমাকে ও আপনাদের সবাইকে কবুল করুন আমীন ইয়া রব্বাল আ'লামিন।

আল্লাহ মনোনিত ধর্ম

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
[آل عمران: 19]

অর্থ:নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। [সূরা আলে-ইমরান: 19]

আল্লাহ মনোনিত ধর্ম হলো দ্বীন ইসলাম। এটি একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান এবং মানুষের অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান। ইসলাম জীবনের সকল দিক- ব্যক্তি ও সামাজিক, বস্তুগত ও নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, আইনি ও সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে । তিনি তার সৃষ্টির সবার কল্যাণের জন্য এই বিধান পাঠিয়েছেন। তাই ইসলাম শুধু মুসলিমদের জন্য না অমুসলিমদের জন্যও কল্যাণকর।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্বাচিত এবং নির্ধারিত। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্বাচিত এবং নির্ধারিত।

অন্য সব গুলো মানুষের বানানো ধর্ম। ব্যক্তিপূজার নিমিত্তে মানুষ তা তৈরি করেছে। পৃথিবীর শুরু থেকে সকল নবীদের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তারা সকলেই মুসলিম। ইসলামই একমাত্র মুক্তির পথ। ইসলামকে যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে তারাই শুধু মুসলিম।

ইসলামকে যারা মানে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তারাই শুধু মুক্তি পাবে। ইসলামকে মানতে হবে পূর্ণাঙ্গরূপে। অন্য সকল মানদণ্ডের উপরে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন সহ সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে একমাত্র মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ইসলামের প্রতিটি বিধানই কল্যাণময়। কখনও কোন বিশেষ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কল্যাণময়। আবার কখনো বিশেষ বিষয়ে কল্যাণ আপাতভাবে ধীরগতির হলেও সামষ্টিকভাবে কল্যাণ স্পষ্ট। এজন্য কখনো কখনো মনে হতেপারে যে ইসলামের বিধান এমন কেন? বা এটা ইসলামে অনুমোদিত কেন? গভীর চিন্তা করলে বুঝা যায়, যদিও একপক্ষ বিচারে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ আছে বলে মনে হয়; কিন্তু সামগ্রিকতা বিচারে দেখা যায় এর চেয়ে সুন্দর ও কল্যাণময় বিধান আর হতেই পারে না।

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মহান আল্লাহতালা পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। তাতে নিহিত রয়েছে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষের কাছে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينذنا

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা মায়েদা: আয়াত ৩)

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম আল্লাহ তাআলার কাছে গৃহীত হবে না। ইসলাম এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই একমাত্র মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। আখেরাতে নাজাত দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين

কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৮৫)
একজন ব্যক্তি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে মানে তা তখনই বলা হবে, যখন সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের অনুশাসনকে মেনে চলবে। নববী মানহাজের উপর অটল এবং অবিচল থাকবে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

হে মুমিনগণ তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিওনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (সূরা বাকারা: আয়াত ২০৮)
ইসলামকে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির ধর্ম মানার সাথে সাথে অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদকে ইসলামের মত বা তার চাইতে বেশি অথবা তাঁতে কল্যাণ আছে বললে সে মুসলমান থাকবে না।

কেউ যদি মনে করে ইসলাম যেমন ইহকাল ও পরকালে মুক্তি দিবে, তেমনি ভাবে অন্যান্য ধর্মও মুক্তির মাধ্যম হবে, তা হলেও সে মুসলমান থাকবেনা। কেউ যদি মনে করে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান যেমনিভাবে মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, তার মত মানব রচিত আইন কানুনও মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, তাহলেও সে মুসলিম হতে পারবে না। বরং মুসলিম তো সেই যে আল্লাহ তাআলার বিধানকেই মুক্তির একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিশ্বাস করবে এবং মানবে। তাই আসুন আমরা ইসলামকে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির বিধান রূপে গ্রহণ করি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন সহ সকল ক্ষেত্রেই ইসলামকে পালন করি। তার আইন কানুন ও বিধি-বিধান গুলি মেনে চলি।

আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে আমাদের জীবনে চলার সংবিধান রূপে গ্রহণ করি। তাহলে আমরা প্রকৃত মুসলমান হতে পারবো এবং প্রকৃত সফলতা এবং কল্যাণ আসবে।

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের বসবাসের বিধান

পৃথিবীতে বহু মুসলমান বিভিন্ন অমুসলিম দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করছেন। বর্তমানে কেবল ভারতেই মুসলিমদের সংখ্যা ২০ কোটির ওপরে। অর্থাৎ, ভারত হলো সর্বোচ্চসংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এছাড়া চীনে আড়াই কোটি, রাশিয়ায় ১ কোটি ৪০ লাখ, ইউরোপে ১ কোটি ৮০ লাখ এবং আমেরিকায় ৮০ লাখ মুসলিম বসবাস করছেন। এভাবে আফ্রিকার দেশসমূহেও বাস করছেন কোটি কোটি মুসলমান।

তানজানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এশিয়ার দেশসমূহ-যেমন সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ইত্যাদিতেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলমান বাস করছেন।

মুসলিম দেশ ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের জন্য যা সহজ ও স্বাভাবিক, অমুসলিম দেশে সেটা ততটা সহজ ও স্বাভাবিক নয়। এখন ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতে অনেকেই আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। প্রকাশ্যে ধর্মপালনে বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। এর প্রেক্ষিতে তাদের জন্য বিশেষ কৌশল ও বিধান গ্রহণ করা জরুরী হয়ে উঠেছে।

অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের বসবাসের মাসাআলায় শরয়ি প্রথম প্রশ্ন হলো, সেখানে অবস্থান ও বসবাস সম্পর্কে শরিয়ত কী বলে, মুসলিম দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকা কি জায়িজ?

এ মাসআলার শরয়ি বিধান জানতে দুটি ভিত্তির ওপর চোখ রাখা আবশ্যক:

১. যে-অমুসলিম দেশে কোনো মুসলিম থাকছেন বা থাকতে চান, তাঁর জন্য সেখানকার আইনি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কেমন হবে। অবস্থার পার্থক্যের কারণে বিধানেও পার্থক্য ঘটবে।

২. সেখানে বসবাসের কারণ কী। কারণের পার্থক্যের জন্য বিধানও ভিন্ন হবে।

অমুসলিম দেশে বসবাস নাজায়িযের দলিল

১.

الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
[النساء: 97]

অর্থ:যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। [সূরা নিসা: 97]

উক্ত আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর: কুফরির এলাকা থেকে ইসলামের এলাকার দিকে হিজরত না করে নিজেদের উপর যুলুম কারীদেরকে ফিরিশতারা মৃত্যু দিয়েছে। ফিরিশতারা তাদের জান কবজের সময় তিরস্কার করে বলবে: তোমরা কোন্ অবস্থায় ছিলে? মুশরিকদের মাঝে তোমাদেরকে ভিন্ন করে চিনার ব্যাপার কী ছিলো? তখন তারা কৈফিয়তের সুরে বলবে: মূলতঃ আমরা দুর্বল ছিলাম। আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার কোন শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের ছিলো না। তখন ফিরিশতারা তাদেরকে তিরস্কার করে বলবে: আল্লাহর শহরগুলো কি প্রশস্ত ছিলো না যেগুলোর দিকে তোমরা বের হয়ে যেতে পারতে নিজেদের ধর্ম ও জীবনকে লাঞ্ছনা ও পরাধীনতা থেকে রক্ষা করতে? বস্তুতঃ হিজরত না করাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। যা তাদের জন্য একটি নিকৃষ্ট গন্তব্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

২. সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

" . ُأَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُه

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কেউ কোন মুশরিকের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সাথে বসবাস করলে সে তাদেরই মত।
সুনানে আবু দাউদ: ২৭৮৭

৩.

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ:
لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا

আমি সেসব মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন-আল্লাহর রাসুল ﷺ কেন? রাসুল বললেন-যাতে তাদের কেউ অপরের আগুন দেখতে না পায়।
মুসনাদু আহমাদ: ১৬৯৫২; সুনানু আবি দাউদ: ২৪৭৯; তাবারানি: ৯০৭; সুনানু বায়হাকি: ১৭৫৫৬

৪. সামুরা ইবনু জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন:
لا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوْهُم فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا

তোমরা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করবে না এবং তাদের সঙ্গে একত্রে থাকবে না। যারা তাদের মধ্যে বসবাস করবে বা তাদের সঙ্গে একত্রে থাকবে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।
তাবারানি: ৬৯০৫: মুসতাদরাকু হাকিম: ২৬২৭; সুনানু বায়হাকি: ১৮২০

অমুসলিম দেশে বসবাস জায়িযের দলিল

১.

ُالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُور
[الملك: 15]

অর্থ: তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। [সূরা মুলক:15]

২.কোনো কোনো সাহাবি মক্কার কাফিরদের যাতনায় ক্লিষ্ট হয়ে হাবশার খ্রিষ্টান শাসিত রাষ্ট্রে চলে যান। যতদিন আল্লাহ মদিনায় হিজরতের উপযোগিতা সৃষ্টি করেননি, ততদিন তাঁরা সেখানে বসবাস করেন। এমনকি নবিজি ﷺ এ মদিনায় হিজরতের নির্দেশ জারির পরও কোনো কোনো সাহাবি হাবশায় বসবাস করছিলেন। আর এ সবকিছু নবিজির সন্তুষ্টি অনুযায়ী ছিল। খোদ নাজাশি মুসলিম হওয়ার পর হিজরত করে মদিনায় আসার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নবিজি ﷺ-র অনুমতি পেয়ে নিজের অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করতে থাকেন। যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন নবিজি তাঁর গায়েবানা জানাজা পড়েন। তারপর বলেন:

َمَاتَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَة

আজ একজন ভালো মানুষ মারা গেলেন। তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের আসহামা নামক ভাইয়ের জানাজা পড়ো।
ফাতহুল বারি, সহিহ বুখারি: ৭/২৪

৩.রাসুলﷺ মক্কা বিজয়ের আগে কোনো কোনো সাহাবিকে মক্কায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন, অথচ মক্কা বিজয়ের আগে তা অমুসলিম রাষ্ট্র ছিল। যেমন, আপন চাচা আব্বাস রা.-কে তিনি মক্কায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর ব্যাপারে ধর্মীয় ফিতনার আশঙ্কা ছিল না। ব্যক্তিগত সম্মান এবং বংশীয় প্রভাব ও দৃঢ়তার কারণে কাফিররা তাঁর প্রাণ ও সম্পদের কোনো ক্ষতি করতে পারত না। এতে প্রমাণিত হয়, অমুসলিম রাষ্ট্রে যদি ইমান-ইসলাম এবং জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকে, তাহলে বসবাসের অনুমতি রয়েছে। অবশ্য আব্বাস রা.-এর ব্যাপারে এ কথা বলা যায় যে, তিনি হিজরতে সক্ষম ছিলেন না। তাই হিজরতের

বিধান থেকে নবিজি ﷺ তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন, যা ব্যাপকভাবে দুর্বলদের বিধানভুক্ত ছিল।
(আল-উম্ম: ২/১৬৯; আল-মুগনি: ১০/৫৫; আস-সুনানুল কুবরা: ৯/১৫)

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান ও বসবাসের শর্ত

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান ও বসবাস কখন জায়িয ও কখন নাজায়িয তার মুলে রয়েছে প্রধান দু'টি শর্ত।
দু'টি শর্ত সাপেক্ষে তার জন্য সেখানে যাওয়া এবং বসবাস করা জায়েয হবে।

অমুসলিমদের দেশে বসবাসের বিধান সংক্রান্ত
সৌদি আরবের সর্বোচ্চ 'উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য, বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও উসূলবিদ, আশ-শাইখ, আল-'আল্লামাহ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.] প্রদত্ত ফাতওয়া—

অমুসলিম-কাফিরদের দেশে বসবাস করা মুসলিমের দ্বীন, চরিত্র, চলাফেরা ও শিষ্টাচারের জন্য খুবই বিপজ্জনক। আমরা নিজেরা এবং আমরা ছাড়া আরও অনেকেই এটা প্রত্যক্ষ করেছি যে, যারা সেখানে বসবাসের জন্য গিয়েছে, তাদের অনেকেই বিপথগামী হয়েছে, ফলে তারা সেখানে যা নিয়ে গিয়েছিল, তার বিপরীত জিনিস নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। তারা সেখান থেকে পাপাচারী হয়ে এসেছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ নিজের দ্বীন পরিত্যাগ করে সকল ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস (নাস্তিকতা) নিয়ে ফিরে এসেছে। আল-'ইয়াযু বিল্লাহ (আল্লাহ'র কাছে এ থেকে পানাহ চাই)।
এক পর্যায়ে তারা নিরেট অবিশ্বাসের দিকে চলে যায় এবং ধর্ম ও পূর্ববর্তী-পরবর্তী ধর্মপালনকারীদের দিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ শুরু করে। তাই সকলের জন্য এ থেকে সতর্ক থাকা

এবং এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক বিষয়ে নিপাতিত হওয়া থেকে নিরোধকারী শর্ত আরোপ করা বাঞ্ছনীয়।

অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য প্রধান শর্ত

মুসলিম রাষ্ট্রের বসবাসের জন্য অবশ্যই দুটি প্রধান শর্ত পূরণ হতে হবে। যথা:

প্রথম শর্ত: বসবাসকারীকে স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তার এমন ‘ইলম, ঈমান ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে, যা তাকে দ্বীনের ওপর অটল থাকার মতো এবং বক্রতা ও বিপথগামিতা থেকে বেঁচে থাকার মতো আত্মবিশ্বাসের জোগান দেয়। আর কাফিরদের প্রতি তার অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকতে হবে। অনুরূপভাবে কাফিরদের সাথে মিত্রতা ও তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। কেননা তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিপন্থি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُم

“তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো জাতিকে পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে; যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, কিংবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।” [সূরাহ মুজাদালাহ: ২২]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِين

“হে মু’মিনগণ, ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে অবশ্যই তাদেরই একজন।

নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, 'আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোনো বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে।' অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে।" [সূরাহ মা'ইদাহ: ৫১-৫২]

নাবী ﷺ বলেছেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ "মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে (পরকালে) তার সাথেই থাকবে।" [সাহীহ বুখারী, হা/৬১৬৯; সাহীহ মুসলিম, হা/২৬৪০]

আল্লাহ'র শত্রুদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ। কেননা তাদেরকে ভালোবাসলে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করা এবং তাদের অনুসরণ করা, কিংবা কমপক্ষে তাদের কর্মের বিরোধিতা না করা—জরুরি হয়ে যায়। একারণে নাবী ﷺ বলেছেন, "মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে (পরকালে) তার সাথেই থাকবে।"

দ্বিতীয় শর্ত: নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ, বসবাসকারী ব্যক্তি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ইসলামের নিদর্শনাবলি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। নামাজ, জুমু'আহ ও জামা'আত—যদি তার সাথে জামা'আতে নামাজ ও জুমু'আহ প্রতিষ্ঠা করার মতো কেউ থেকে থাকেন—প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। অনুরূপভাবে জাকাত, রোজা, হজ ও অন্যান্য শার'ঈ নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। যদি এসব কাজ করার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে তখন হিজরত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে বসবাস করা জায়েজ হবে না।

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) "মুগনী" গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় হিজরতের ব্যাপারে মানুষের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "যার ওপর হিজরত করা ফরজ: যে ব্যক্তির হিজরত করার মতো সক্ষমতা আছে, আর তার জন্য স্বীয় দ্বীনকে প্রকাশ করা এবং কাফিরদের মধ্যে বাস করে দ্বীনের ওয়াজিব বিষয়াদি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না, সে ব্যক্তির ওপর হিজরত করা ওয়াজিব। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম।' ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে?' সুতরাং ওরাই তারা, যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।" (সূরাহ নিসা: ৯৭)

এটা হলো কঠিন হুঁশিয়ারি, যা হিজরতের আবশ্যকিয়তা প্রমাণ করে। কেননা দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয় পালন করা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। হিজরত একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব; এটি এমন একটি বিধান, যা আবশ্যকীয় কর্মাবলিকে পূর্ণতা দান করে। আর "যা ব্যতিরেকে ওয়াজিব কাজ পূর্ণ হয় না, সেটাও ওয়াজিব।"(ফিকহের প্রসিদ্ধ একটি মূলনীতি, প্রাগুক্ত:৯১)

উল্লিখিত প্রধান শর্ত দু'টি পূরণ হওয়ার পর অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান ও বসবাস করা মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে। **অন্যথায় যেকোন একটি শর্ত অপূরণ থাকলে** মুসলমানদের জন্য অমুসলিম দেশে অবস্থান ও বসবাস করা বৈধ হবে না।

উল্লিখিত প্রধান দু'টি শর্ত সাপেক্ষে মুসলমানদের অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করার বিভিন্ন কারণ ও বিষয়কে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করা যায়। পরবর্তীতে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।
তার আগে অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকার সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক।

অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকার

ফকিহরা অমুসলিম দেশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা বিধান বর্ণনা করেছেন। ফিকহের গ্রন্থাদিতে এ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা এখানে এ তিনটি ভাগের আওতায় আসা মাসআলাগুলোর সারাংশ তুলে ধরব:

১। এমন অমুসলিম রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিমদের পক্ষে বাস করা খুবই কঠিন, যেখানে একজন মুসলমানের নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের দীন, ইমান, জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই, যেখানকার পরিবেশ হিজরত-পূর্বকার মক্কিজীবনের মতোই ইসলামবিরুদ্ধ।

এমন দেশে যাওয়া বা সেখানে বাস করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িজ। যে সেখানে আগে থেকে বাস করছে, কোনো মুসলিম বা নিরাপদ দেশে হিজরত করার সুযোগ থাকলে তার অবশ্যই তা করা উচিত।

(মুগনিল মুহতাজ, শিরবিনি: ৬/৫৪; আল-উন্ম, ইমাম শাফিয়ি: ২/১৬৯; আল-হাবিল কাবির, মাওয়ারদি: ১৮/৩১১; রাওজাতুত তালিবিন, আল্লামা নবিব: ৭/৪৭৪)

দীনের জন্য শঙ্কাকুল বা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাস না করে সেখান থেকে হিজরত করতে হবে, এই বক্তব্যের উৎস হলো মহান আল্লাহর বাণী:
যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা বলে, 'আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে?' এদেরই আবাসস্থল হলো জাহান্নাম এবং তা কতই-না মন্দ স্থান! [সুরা নিসা: ৯৭]

এ আয়াতে এমন অঞ্চলে বাস করাকে জুলুম ও কঠিন গুনাহ বলা হয়েছে, যেখানে নিজের ধর্ম ও ইমান রক্ষা করে চলা যাবে না। এটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের সেখান থেকে বেরোনোর এবং উপযুক্ত কোনো স্থানে বসবাসের সামর্থ্য রয়েছে। অন্যথায় এমন রাষ্ট্রে যাওয়া ও বাস করা কীভাবে জায়িজ হতে পারে!

২। এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিমদের জন্য সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস আশঙ্কাজনক নয় এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাও আছে। নিজের বা নিজের বংশধরদের ইমান ও ইসলাম যেখানে রক্ষা করে চলা সম্ভব। এমন রাষ্ট্রে বসবাসের ব্যাপারে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে:

ক.একটি মত হলো, মুসলিমদের জন্য এমন স্থানে গমন বা বসবাস করা জায়িজ নয়। যদি সাধ্যের মধ্যে থাকে, তাহলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত মুসলিমদের জন্য সেখান থেকে অন্যত্র হিজরত করা ওয়াজিব। এই মত মালিকি ফকিহদের। শাফিয়িদের একটি মতও এরকমই। মালিকি ফকিহদের দৃষ্টিতে সাধারণ অবস্থায় অনৈসলামিক রাষ্ট্রে বসবাস করা জায়িজ নয়- সেখানে দীনের ওপর আমল করা সম্ভব হোক বা না হোক।

খ. দ্বিতীয় মত হলো, এমন রাষ্ট্রে বসবাস করা জায়িজ আছে। বসবাসরত মুসলিমদের জন্য সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব নয়। এই মত হানাফি ও হাম্বলি আলিমদের। শাফিয়িদের প্রধান অভিমতও এটিই।

(আহকামুল কুরআন: ২/৩০৫; ইলাউস সুনান ১২/৩৬১; কাশশাফুল ইকতিনা, আল্লামা বাহুতি: ৩/৪৪)

৩। এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্র যেখানে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নেই, মুসলমানরা যেখানে বাস করেন দুর্বল সংখ্যালঘু হয়ে এবং মানহানির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। কিন্তু হিজরত করার মতো স্থান না থাকলে বা কোনো মুসলমান অন্যত্র সফরের ব্যয় বহনে সমর্থ না হলে সেখানে থেকে যাওয়াটা দোষের নয়। ফকিহরা একমত যে, এমন মুসলিমদের ওপর হিজরত ওয়াজিব নয়। এমন রাষ্ট্রে বসবাস তাদের জন্য গুনাহের কারণও নয়।(কাশশাফ: ১/৫৫৫)
এ বিধানের উৎস হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন::

ًإِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيْلَة
وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا
তবে যেসব অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না। (সুরা নিসা: ৯৮)

এ আয়াতে দুর্বল ও নিরুপায় লোকেদের হিজরতের বিধানের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ছাড় শুধু এমন সময়ের জন্য, যখন তাদের পক্ষে হিজরতের কোনো উপায়ই থাকে না। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস ৩/২২৮; ফাতহুল উলা: ৭/৩৭৫-৩৭৬)

অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানের কারণ ও বৈধ প্রকার

উপরে উল্লিখিত প্রধান শর্ত দু'টি পূরণ হওয়ার পর (উপরে আলোচলা করা হয়েছে) অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করার বিভিন্ন কারণ ও বৈধ প্রকার নিম্নরুপ। যথা:

১.দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে সফর ও অবস্থান

ইসলামের দিকে দা'ওয়াত এবং ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য বসবাস করা এটি এক প্রকার জিহাদ। সক্ষম ব্যক্তির ওপর এ কাজ করা ফরজে কিফায়াহ।

তবে শর্ত হলো—দা'ওয়াত বাস্তবায়িত হতে হবে এবং দা'ওয়াত প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকা যাবে না। কেননা ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেওয়া দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর এটিই রাসূলগণের পথ। নাবী ﷺ সর্ব জায়গা ও সর্ব সময়ে ইসলামের তাবলীগ (প্রচার) করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً "আমার পক্ষ হতে (মানুষের কাছে) একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও।" [সাহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১]

অমুসলিমদের দা'ওয়াত দেয়ার গুরুত্ব:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون
[الذاريات: 56]

অর্থঃ আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। [সূরা যারিয়াত: 56]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে আহসানুল বায়ান:

আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর বিধিগত (শরয়ী) ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন, যা তিনি ভালোবাসেন ও চান। আর তা হল, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আনুগত্যও শুধু তাঁরই করবে। এর সম্পর্ক যদি তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছার সাথে হত, তবে কোন মানুষ ও জ্বিন আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখতা অবলম্বন করার কোন ক্ষমতাই রাখত না। অর্থাৎ, এই আয়াতে সকল মানুষ ও জ্বিনকে জীবনের সেই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করানো হয়েছে, যেটাকে তারা ভুলে গেলে পরকালে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এই পরীক্ষায় তারা অসফল গণ্য হবে, যাতে মহান আল্লাহ তাদেরকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন।

ِخَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه

অর্থ:তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সুরা আল-ইমরান:১১০)

মুফাসসিরে কুরআন হযরত ইমাম সুদ্দী (র.) এই আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমর রা.-এর বর্ণনা নকল করেছেন যে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তবে (ْأَنْتُم) বলতেন, এতে আমরা সকলেই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। অথচ আল্লাহ তায়ালা (كنتم) বলেছেন, বিশেষভাবে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কে। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ মেহনত করবেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ উম্মত হবেন। তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে এবং তারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ُالنَّاس 'মানুষ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো, অমুসলিমরাও মানুষ। মুসলিম জাতিকে শুধু মুসলমানদের জন্য পাঠাননি বরং অমুসলিমদের জন্যও পাঠিয়েছেন।

বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. خَيْرَ ٍ أُمَّة 'উত্তম জাতি' বলে সম্বোধন করেছেন।

২. الناس 'মানুষ'।

অর্থাৎ মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করেছেন, ৬শত কোটি অমুসলিম "মানুষ" এর জন্য। ২শত কোটি মুসলমান
خَيْرَ ٍ أُمَّة 'উত্তম জাতি' ৬শত কোটি অমুসলিম মানুষকে المَعْرُون ِ সৎকাজের আদেশ করবে এবং المنكر অসৎ কাজের বাধা প্রদান করবে।

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ লিখেছেন- خَيْرَ ٍ أُمَّة উত্তম জাতি হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত।

১.. الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوف ِ সৎ কাজের আদেশ।

২. النَّهْيِ عَنْ المُنْكَر ِ অসৎকাজের নিষেধ।

৩. ايمان بالله আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

দা'য়ীর সফলতা হলো দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার মধ্যে। দা'য়ী দাওয়াত পৌঁছে দিলো তো সফল হয়ে গেল। কারণ পৌঁছে দেয়াই তার দায়িত্ব।

২.ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসবাস

কোনো ব্যক্তি যদি মুসলিম দেশে খুব ভালোভাবে খোঁজাখোঁজি করা সত্ত্বেও জীবিকা উপার্জনের কোন ব্যবস্থা করতে না পারে তখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে যাওয়া বা বসবাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। তহলে উপরে উল্লিখিত প্রধান শর্ত দু'টি পূরণ হওয়ার পর সেখানে

যাওয়া ও বসবাস করে জায়েয হবে। ব্যবসার উদ্দেশ্য অমুসলিম দেশে যাওয়ার কয়েকটি ধরণ হতে পারে:

ক. নিজের দেশে উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকায় কোনো মুসলিম বাধ্য হয়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে বাস করতে শুরু করলে, অধিকাংশ আলিমের মতে তা জায়িজ।(আল-মাবসূত: ১০/৮৮; আহকামুল কুরআন: ১/৫১৫;)

এ বিধানের উৎস পবিত্র কুরআনের এ আয়াত:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُور

অর্থ: 'তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। তাই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিজিক আহার করো। অতঃপর পুনরুত্থিত হয়ে তোমরা তাঁর কাছেই নীত হবে।' [সুরা মুলক: ১৫]

লক্ষণীয়, জমিনে জীবিকার সন্ধানে সফরের বিধানটি বিশেষ কোনো স্থান-কালের জন্য নির্ধারিত নয়।

খ. নিজের দেশে মৌলিক চাহিদা পূরণ করা গেলেও পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্য কোনো অমুসলিম দেশে যাওয়ার দরকার পড়লে, যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। (আহকামুল কুরআন: ১/৪৮৬; আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন: ৫/৩৫১)

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ বলেন:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُم

'তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণে কোনো পাপ নেই।' (সুরা বাকারা: ১৯৮)

৩.চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অবস্থান

কোনো বিশেষ বৈধ কাজের জন্য বসবাস করা। যেমন: চিকিৎসা প্রভৃতি।

কেউ অসুস্থ হলে এবং মুসলিম দেশে উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে অমুসলিম দেশে অবস্থান করে চিকিৎসা নিতে পারবে।
(ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল লিল মুসাফিরিন:৩৯)

এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী বসবাস করা জায়েজ।

৪.পড়াশোনার জন্য অবস্থান

ইসলাম তো প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নবিজি ﷺ মানবতার প্রথম শিক্ষক, যিনি জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। এটাকে সবদিক দিয়ে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি জ্ঞানার্জনে সফরের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন:
مَنْ خَرَجَ في طلب العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ
যে জ্ঞানান্বেষণে বের হয়, সে যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ আল্লাহর পথে থাকে। (সুনানুত তিরমিজি: ২৭৮৫)

এখানে জ্ঞান দ্বারা মূলত উপকারী জ্ঞান উদ্দেশ্য।
এর প্রথমটি হলো ইলমে দীন বা ইসলামি বিদ্যা। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে পার্থিব এমন সকল জ্ঞান উদ্দেশ্য, যা অর্জন করা মৌলিকভাবে জায়িজ আছে এবং যার সঙ্গে মানবিক প্রয়োজন ও সফলতা সম্পৃক্ত, যা ইসলাম ও মুসলিমজাতির উন্নতির ভিত নির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য।

পড়াশোনার জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস করা যা প্রয়োজন অনুযায়ী বসবাস করা বৈধ প্রকারটিরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটি বসবাসকারীর দ্বীন ও আখলাকের জন্য কতটা নিরাপদ তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কেননা এতে ছাত্র নিজের নিচু মর্যাদা এবং তার শিক্ষকদের উঁচু মর্যাদা অনুভব করে। ফলে সে তাদেরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাদের মতাদর্শ ও লাইফ স্টাইলে পরিতুষ্ট হয়। এক পর্যায়ে সে তাদের অনুকরণ শুরু করে। আল্লাহ যাকে হেফাজত করতে চান, সে ছাড়া কেউ এ থেকে বাঁচতে পারে না; আর তাদের (বেঁচে যাওয়া ছাত্রদের) সংখ্যা খুবই নগন্য।

এতদ্ব্যতীত ছাত্র স্বীয় শিক্ষকের কাছে নিজের প্রয়োজন অনুভব করে, যা তাকে (কাফির) শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং শিক্ষকের ভ্রষ্ট মতাদর্শের ব্যাপারে তাঁর মোসাহেবি করার দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়াও ছাত্র যে ছাত্রাবাসে থাকে, সেখানে তার সহপাঠীরাও থাকে। তাদের মধ্য থেকে সে কতিপয়কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ভালোবাসে এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে। এই প্রকার বসবাসের ভয়াবহতার কারণে এক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্কে থাকা ওয়াজিব। তাই এক্ষেত্রে প্রধান শর্ত দুটোর পাশাপাশি আরও কিছু শর্ত যুক্ত হয়।

যথা:

১ম শর্ত: ছাত্রকে বিবেকগত পক্কতার দিক থেকে উঁচু স্তরের হতে হবে, যার মাধমে সে কল্যাণকারী ও অকল্যাণকারীকে আলাদা করতে পারবে এবং অদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। পক্ষান্তরে কমবয়সী এবং কম বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদেরকে কাফির রাষ্ট্রে পাঠানো তাদের দ্বীন, চরিত্র ও শিষ্টাচারের জন্য খুবই বিপজ্জনক। এরপর এটা তাদের জাতির লোকের জন্যও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন তারা নিজেদের জাতির কাছে ফিরে যায় এবং তাদের মধ্যে ওই বিষ উৎক্ষেপণ করে, যা সে ওই কাফিরদের নিকট থেকে পান করে এসেছে। যেমনটি ইতঃপূর্বে ঘটেছে এবং বাস্তবতাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। ওই সকল ছাত্রদের অনেকেই যা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল, তার বিপরীত বিষয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। তারা তাদের ধার্মিকতা, চরিত্র ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে বিপথগামী হিসেবে ফিরে এসেছে। আর এসব ক্ষেত্রে তারা নিজেরা এবং তাদের সমাজ অর্জন করেছে ভয়াবহ অনিষ্ট, যা এখন সুবিদিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে সেখানে পড়তে পাঠানো মূলত হিংস্র কুকুরের কাছে ভেড়ী বা দুম্বী পেশ করার নামান্তর।

২য় শর্ত: ছাত্রের এমন শার'ঈ 'ইলম থাকতে হবে, যার দ্বারা সে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং হক দিয়ে বাতিলকে প্রতিহত করতে পারে। যাতে করে কাফিররা যে বাতিল মতাদর্শের ওপর আছে, সে তার দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে ওই মতাদর্শকে হক মনে করে না বসে, অথবা তা তার কাছে গোলমেলে হয়ে না যায়, কিংবা তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ না হয়। অন্যথায় সে দিশেহারা হয়ে যাবে, কিংবা বাতিলের অনুসরণ করতে শুরু করবে। হাদীসে বর্ণিত দু'আয় বলা হয়েছে,

اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علي فأضل

“হে আল্লাহ, আপনি আমার কাছে হককে হক হিসেবেই দেখান এবং আমাকে তা অনুসরণ করার সামর্থ্য দিন। আপনি আমার কাছে বাতিলকে বাতিল হিসেবেই দেখান এবং আমাকে তা বর্জন করার সামর্থ্য দিন। আর আপনি বাতিলকে আমার ওপর গোলমেলে করে তুলিয়েন না, যার দরুন আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাই!”

৩য় শর্ত: ছাত্রের এমন ধার্মিকতা থাকতে হবে, যা তাকে হেফাজত করবে এবং যার মাধ্যমে সে কুফর ও পাপাচারিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। ধর্মপালনে দুর্বল ব্যক্তির জন্য ওখানে বসবাস করা নিরাপদ নয়, তবে আল্লাহ যাকে নিরাপদ রাখতে চান তার কথা স্বতন্ত্র। কেননা ওখানে প্রতিরোধকারী দুর্বল, আর আক্রমণকারী শক্তিশালী।

ওখানে কুফর ও পাপাচারিতার অসংখ্য শক্তিশালী মাধ্যম রয়েছে। যখন এসব মাধ্যম কোনো দুর্বল প্রতিরোধকারীর সম্মুখে এসে পড়ে, তখন সেগুলো তাদের কাজ করে চলে যায়।

৪র্থ শর্ত: সে যে বিদ্যা অর্জনের জন্য সেখানে বসবাস করছে, সেই বিদ্যার প্রয়োজন থাকতে হবে। যেমন ওই বিদ্যা অর্জনের মধ্যে মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত থাকা এবং উক্ত বিদ্যার অস্তিত্ব মুসলিমদের দেশে না থাকা। কিন্তু তা যদি অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়, কিংবা সেই বিদ্যার অস্তিত্ব মুসলিম দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকে, তাহলে উক্ত বিদ্যা অর্জনের জন্য কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করা জায়েজ নয়। যেহেতু সেখানে বসবাসের মধ্যে রয়েছে দ্বীন ও আখলাকের ক্ষতি এবং কোনো ফায়দা ছাড়াই বিপুল পরিমাণ সম্পদের অপচয়।

৫.মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অবস্থান

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং কাফির রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখতে সেখানে বসবাস করা। যেমন: দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ। এক্ষেত্রে যে কাজের জন্য এখানে অবস্থান করতে হচ্ছে, সে কাজের বিধান যা, এখানে বসবাসের বিধানও তা। উদাহরণস্বরূপ কোনো কালচারাল অ্যাটাশে ছাত্রদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং তাদেরকে ইসলাম

ধর্ম এবং ইসলামে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শিষ্টাচার পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেখানে বসবাস করছেন। তাঁর সেখানে বসবাস করার ফলে অর্জিত হয় বিরাট কল্যাণ এবং নিশ্চিহ্ন হয় বড়ো ধরনের অকল্যাণ

৬.কাফিরদের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য অবস্থান

কাফিরদের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য এবং তারা যে ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ, বাতিল ইবাদত, নষ্ট চরিত্র ও নৈরাজ্যপূর্ণ চলাফেরার ওপর রয়েছে—তা জানার জন্য সেখানে অবস্থান করা। যাতে করে মানুষকে তাদের মাধ্যমে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া থেকে সতর্ক করা যায়, আর যারা তাদেরকে ভালো মনে করে, তাদের কাছে ওদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা যায়। এ ধরনের বসবাসও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এর মাধ্যমে কুফর ও কাফিরদের থেকে সতর্ক করা হয়, যা ইসলাম ও তার আদর্শের প্রতি উৎসাহপ্রদানের মতো বিষয়কে ধারণ করে। কেননা কুফরির অনিষ্টতাই ইসলামের সঠিকতার প্রমাণ। তাইতো বলা হয়, “বস্তুর প্রকৃতত্ব তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়।”
কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত আছে। আর তা হলো—ওই কাজের ভালো ফলের চেয়ে বড়ো কোনো ক্ষতির আনয়ন ব্যতিরেকেই উক্ত কাজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে হবে। যদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হয়, তথা কাফিররা যে মতাদর্শের ওপর রয়েছে তা প্রচার করতে এবং তা থেকে সতর্ক করতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে অবস্থান করার কোনো ফায়দা নেই। আবার যদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার সাথে সাথে তার চেয়ে বড়ো কোনো ক্ষতি অর্জিত হয়, তাহলে উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। যেমন: কাফিররা প্রচারকারী ব্যক্তির কাজের মোকাবেলায় ইসলামকে এবং ইসলামের রাসূল ও ইমামগণকে গালিগালাজ করা শুরু করল (তাহলে উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক)।

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ ,
َإِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون

“আর তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করে, ফলে তারা বিদ্বেষ ও অজ্ঞতাবশত গালি দিবে আল্লাহকে। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য

তাদের কর্মকে শোভিত করেছি। তারপর তাদের রবের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।" [সূরাহ আন'আম: ১০৮]

এই প্রকারটি কাফির রাষ্ট্রে মুসলিমদের গুপ্তচর হিসেবে অবস্থান করার মতো। যাতে সে জানতে পারে যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা কী গুপ্ত ষড়যন্ত্র করছে, ফলে তাদের থেকে মুসলিমরা সতর্ক থাকতে পারে। যেমন নাবী ﷺ খন্দক যুদ্ধে হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) কে মুশরিকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাদের খবর জানার জন্য।

(১-৬ প্রকার পরিমার্জিত ও সংগৃহীত) তথ্যসূত্র:
ইমাম 'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ), মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, খণ্ড: ৩; দারুল ওয়াত্বান, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৩।

অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ ও স্থায়ীভাবে বসবাস করার বিধান

অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করা: কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করা, সে দেশের ন্যাশনালিটি বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করা এবং সে দেশের নাগরিকদের সমান আবাসন সুযোগ এবং সমান নাগরিক সুবিধা গ্রহণ করে স্বতন্ত্রভাবে নিজের আবাসস্থল গড়ে তোলা, এমন একটি বিষয় যার হুকুম স্থান-কাল-পাত্রভেদে এবং বসবাসকারীদের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাধারার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন:

১. রাজনৈতিক নিরাপত্তা অর্জন:

যদি কোন মুসলমানের ওপর স্বদেশে কোন অন্যায় অভিযোগ ও অপরাধ ছাড়াই অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়, বেআইনিভাবে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয় অথবা তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়; এমতাবস্থায় কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া এসব জুলুম অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার যদি কোন পথ খোলা না থাকে,

তাহলে এই অবস্থায় ওই ব্যক্তির জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং সেই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তথায় অবস্থান করা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে।
তবে শর্ত হল এই যে,
ক.তাকে এ ব্যাপারে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে সেখানে গিয়ে তার জীবন চলার পথে ধর্মীয় অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলবে।
খ.সেখানকার প্রচলিত যাবতীয় মন্দকাজ ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

এর দলিল হল, সাহাবাগণ মক্কায় কুরাইশদের কাছে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তখন হাবশায় কাফেরদের রাজত্ব চলছিল। তখন সাহাবায়ে কেরাম সেখানে অবস্থান করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী সেখানে অবস্থান করেছিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) খায়বার যুদ্ধের সময় ফিরে এসেছিলেন। তখন ছিল হিজরী সপ্তম বছর। আর মানুষের আত্মিক অধিকার হল যে, সে তার নফস বা আত্মাকে যে কোন ধরনের অন্যায় ও জুলুম থেকে নিরাপদে রাখবে। সুতরাং যদি সে কোন কাফের রাষ্ট্র ছাড়া নিজের জন্য কোন নিরাপদ স্থান না পায় তাহলে তার জন্য সেখানে হিজরত করাতে কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হবে এবং হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।

২.জীবিকা নির্বাহের সন্ধানে:

এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে চরম সঙ্কটে নিপতিত হয়; এবং বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও যদি নিজের মুসলিম রাষ্ট্রে জীবিকা নির্বাহের কোন সুযোগ সৃষ্টি না হয়, এমনকি এখানে সে এক মুঠো খাবারেরও মুখাপেক্ষী হতে হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে তার বৈধ কোন চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায়, আর এই সুযোগে যদি সে সেই অমুসলিম দেশে বসবাস শুরু করে দেয়, তাহলে [এক নম্বর উত্তরে বর্ণিত দুইটি শর্তের সাথে] তার জন্য সেখানে বসবাস করা জায়েয হবে। কেননা অন্যান্য ফরয সমূহের মধ্যে হালাল উপার্জন ও একটি অন্যতম ফরয। যার জন্য শরীয়ত কোন স্থান বা কোন জায়গাকে সীমাবদ্ধ করে।

দেয়নি; বরং এর জন্য রয়েছে ব্যাপকতর সাধারণ অনুমতি। পবিত্র কুরআনের আয়াতে হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্য যে কোন স্থানে গমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور

'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর এবং তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।' (সূরা মূলক : আয়াত ১৫)

৩.দা'ওয়াত ও তাবলীগ:

এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এই নিয়তে বসবাস করে যে, সে দেশে অবস্থানরত অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাবে, তাদেরকে মুসলমান বানাবে অথবা সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের দ্বীন ও শরীয়তের সহীহ তালিম দেবে। দ্বীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এবং শরীয়তের আহকাম ও বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করবে। এ জাতীয় নিয়তে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা শুধু জায়েযই নয় বরং এটি একটি বিরাট সওয়াব ও পুণ্যময় কাজ। অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এই মহৎ উদ্দেশ্য ও সৎ নিয়ত নিয়ে বিভিন্ন অমুসলিম দেশে বসবাস করেছেন। পরবর্তীকালে এগুলো তাদের জীবনে উত্তম ও সৎকর্ম এবং তাদের বর্ণাঢ্য জীবনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৪.ভোগ-বিলাস ও উন্নত জীবন যাপনের লক্ষ্যে:

যদি স্বদেশে কোন ব্যক্তির এই পরিমাণ জীবিকার বন্দোবস্ত থাকে, যার মাধ্যমে সেই শহরের অবস্থানরত অন্যান্য মানুষের জীবন চলার মান অনুযায়ী সেও চলতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারপরও শুধু জীবন চলার মান আরো উন্নত করার উদ্দেশ্যে, সম্পদ বৃদ্ধি এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে থাকে, তাহলে

এ জাতীয় হিজরত মাকরুহের আওতাভুক্ত (মাকরুহ তাহরীমি) হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কোনরূপ ধর্মীয় বা পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া সেই রাষ্ট্রে বসবাস তাদের প্রচলিত অপসংস্কৃতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ারই নামান্তর হবে। বিনা প্রয়োজনে নিজের দ্বীন-ধর্ম এবং আখলাক-চরিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কেননা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কেবল আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস এবং সুখ-স্বর্গের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে, তার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দুর্বল হয়ে যায় এবং খুব দ্রুতই এ ধরনের মানুষ বিধর্মীদের আচার-আচরণের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়।

এ কারণেই হাদীস শরীফে তীব্র প্রয়োজন ছাড়া মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এ সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফে হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.) থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله

'যে ব্যক্তি মুশরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করে, সে তাদেরই মত।' (আবু দাউদ)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন :

أنا بربي من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله لم؟ قال لا ترى أي ناراهما .

‘আমি ওইসব মুসলমানদের থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী? জবাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ইসলামের অগ্নি আর কুফুরের অগ্নি একই সঙ্গে থাকতে পারে না। তোমরা এটি পৃথক করতে পারবে না যে, এটি কি মুসলমানদের অগ্নি না মুশরিকদের অগ্নি।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের অনেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে এর অর্থ হল এই যে, হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমান আর মুশরিক সমকক্ষ হতে পারে না। উভয়ের আহকাম ভিন্ন ভিন্ন। আবার কোন কোন আলেম বলেছেন, এই হাদীসটির সারমর্ম হল এই যে, আল্লাহ তাআলা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরকে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা জায়েয নেই। কেননা যখন মুশরিকরা তাদের (বিজয়ের) মশাল সমুজ্জল করবে, আর তাদের সঙ্গে মুসলমানরা নীরবতা অবলম্বন করে থাকবে, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিই মনে হবে যে, তারা (মুসলমানরা) এদেরই অন্তর্ভুক্ত। ওলামায়ে কেরামের এই ব্যাখ্যা দ্বারা একথাও পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেও কাফেরদের রাষ্ট্রে গমণ করে, তাহলে তার জন্য সেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা মাকরূহ।' (মাআলিমুস সুনান লিল-খাত্তাবী : [আবু সুলায়মান আল খাত্তাবী, মৃত্যু : ৩৮৮ হি.] খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৩৭)

হযরত মাকহুল (রাযি.) থেকে সুনানে আবু দাউদের মারাসিলে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لا تتركوا الذرية ازاء العدو.

‘নিজের সন্তানদের মুশরিকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেবে না।

এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবলমাত্র চাকরি করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং তাদের জনসংখ্যা বর্ধিত করার কারণ হওয়া এমন একটি (ধিকৃত) কাজ, যার দ্বারা তার বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় ।

৫.মুসলমানের ওপর নিজের বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে:

কোন ব্যক্তি যদি লোক সমাজে সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অন্য মুসলমানের ওপর নিজের বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে কিংবা দারুল কুফরের নাগরিত্ব এবং জাতীয়তাকে দারুল ইসলামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করে তাদের ন্যাশনালিটি গ্রহণ করে থাকে অথবা তার পার্থিব জীবনের থাকা-খাওয়া ও চাল-চলনে তাদের নীতি গ্রহণ করে বাহ্যিক জীবনে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের মত হয়ে যাওয়ার জন্য বসবাস করে থাকে তাহলে এ জাতীয় যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট যে, এর জন্য কোন দলিল পেশ করা প্রয়োজন নেই।

ইসলাম ও ভ্রমণ

মহান আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীকে কি অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।রংবেরং এর মানুষ,প্রাণীকুল ইত্যাদি দ্বারা এ পৃথিবীকে ঐশ্বর্য্যময় করে সাঝিয়েছেন।পাহাড়-পর্বত নদী-নালা খাল-বিলকে ভারসাম্যপূর্ণ করে কতইনা সুনিপুণ ভাবে গড়েছেন।পৃথিবীকে স্বর্গের প্রেরণাকারী রূপে রূপায়িত করেছেন।সবই করেছেন একমাত্র মানুষের সেবার জন্যে।আর এ সবকিছুই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রমাণ রাখে। আল্লাহর মাহাত্ম্যর প্রমাণের জন্য পৃথিবীর যে কোনো একটি প্রাণীই যথেষ্ট।আল্লাহ তা'আলার নিপুণ শিল্পে শিল্পায়িত এ পৃথিবীকে দেখা ও জানা এবং এ সম্পর্কে গবেষনা করা প্রতিটি মানুষের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তরজমাঃ- বলুন! তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ! কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন।অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন।নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।(সূরা আনকাবুত-২০)

পৃথিবীকে ঘুরে দেখা ও তার কিছু মিথ্যা অধিবাসীদের উপর আল্লাহ তা'আলার আপতিত আযাব দেখে সত্যর শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

তরজমাঃ-বলে দিনঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতপর দেখ! মিথ্যারোপ কারীদের পরিণাম কি হয়েছে?(সূরা-আন'আম-১১)

তাফসীরে কুরতুবী নামে প্রসিদ্ধ "আল জামে লি-আহকামিল কুরআন" এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়,

وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم ، وأهل الديار ، والعاقبة آخر الأمر .

তাওহীদের শিক্ষাগ্রহণার্তে পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীদের উপর আপতিত আযাবের নিদর্শনবাহী এলাকা পরিভ্রমণ করা মুস্তাহাব।যাতে করে পরবর্তী উম্মত শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

ভ্রমণের প্রকারভেদ সম্পর্কে চার মাযহাব সম্বলীত সর্ব বৃহৎ ফেক্বাহী গ্রন্থ "আল-মাওসু'আতুল ফেক্বহিয়্যায় " উল্লেখ করা হয়,

قسم الحنفية السفر من حيث حكمه إلى ثلاثة أقسام: سفر طاعة كالحج والجهاد، وسفر مباح كالتجارة، وسفر معصية كقطع الطريق وحج المرأة بلا محرم.

হানাফি উলামায়ে কেরামগণ সফরকে তিনভাগে ভাগ করে থাকেন।

১.নেকীর সফর যেমনঃ- হজ্ব ও জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর ও ইত্যাদি।

২.বৈধ সফর যেমনঃ- ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর ও ইত্যাদি।

৩.অবৈধ সফর যেমনঃ- ডাকাতি ও মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের হজ্বের সফর ও ইত্যাদি।(২৫/২৭)

অমুসলিম দেশে ভ্রমণ

অমুসলিম দেশ বা এমন মুসলিম দেশ যেখানে প্রকাশ্যে গোনাহ সংগঠিত হয়ে থাকে,এমন দেশ সমূহে সফর করা বৈধ হবে কি না?

এমন প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে,এ সম্পর্কে বিন বায রাহ এর একটি ফাতাওয়া উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ মূলত অমুসলিম দেশ সমূহে না যাওয়াই ফিকহ সম্মত।তবে যদি প্রয়োজনবোধে যেতেই হয় তাহলে এক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে।

তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধঃ

(১) ভ্রমণকারীর কাছে প্রয়োজনীয় ইল্ম বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

(২) তার কাছে এমন দ্বীনদারী বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সে নফসের প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হবে।

(৩) অমুসলিম দেশে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকা।

উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অমুসলিম দেশে সফর করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফিতনার ভয় রয়েছে।এবং তাতে প্রচুর সম্পদও বিনষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া গোনাহের কাজ করা ও দেখা এবং তাতে যেকোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা নাজায়েজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى ۡيَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُم

তরজমাঃকোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে।(সূরা-নিসা-১৪০)

পর্যটনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার কোন দরকার নেই; বরং এমন ইসলামী দেশে যাওয়া যায় যেখানে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা হয়। আমাদের ইসলামী দেশসমূহে আল্লাহর মেহেরবাণীতে যথেষ্ট পর্যটনের স্থান রয়েছে। সেখানে পর্যটনের জন্য যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ছুটি কাটানো সম্ভব।

হালাল খাবার

আল্লাহ তোমাদের হালাল ও পবিত্র যে রিজিক (জীবনোপকরণ) দান করেছেন, তা থেকে তোমরা আহার করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করো, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো। [সুরা : নাহল, আয়াত : ১১৪]

এখানে হালাল ও পবিত্র রিজিক আহার করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হবে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে। কেননা তিনিই যাবতীয় জীবনোপকরণ দান করেছেন।
তাই তাঁরই ইবাদত করতে হবে।

ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য যাবতীয় খরচ নিখুঁত, পবিত্র, সৎ অর্থের মাধ্যমে উপার্জিত হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,
'হে ঈমানদাররা, তোমাদের আমি যেসব পবিত্র রিজিক দিয়েছি, তা থেকে আহার করো। পাশাপাশি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করো, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করে থাকো। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৭২)
সব মানুষের প্রতি হালাল ভক্ষণের নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বৈধভাবে উপার্জনের নির্দেশ প্রত্যেক নবীর জন্যও ছিল। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে রাসুলরা! তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং নেক কাজ করো।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ৫১)

অবৈধভাবে উপার্জিত খাবার খেয়ে ইবাদত করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না। ওই ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।
মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'ওই গোশত (দেহ) জান্নাতে যাবে না, যা হারাম (খাবার) থেকে উৎপন্ন। জাহান্নামই এর উপযোগী।' (ইবনে হিব্বান, হাদিস নম্বর : ১৭২৩, তিরমিজি, হাদিস : ৬১৪)

প্রকৃত মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে হালাল জীবিকা উপার্জনের বিকল্প নেই। হালাল পথে উপার্জিত জীবিকা ভক্ষণে মানুষের স্বভাব-চরিত্র সুন্দর হয়। মানুষের মধ্যে সৎ

সাহস ও সত্যানুরাগ জন্মে। অন্যদিকে হারাম উপার্জন মানুষের মধ্যে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এটি নৈতিক অধঃপতনের প্রেরণা জোগায় ও বিপথগামী হতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই ইসলাম জীবনোপকরণ সংগ্রহে নৈতিকতার প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে। নিজের ও পরিবারের জন্য বৈধ রিজিকের সন্ধান করা মুসলমানের ফরজ দায়িত্ব। হাদিস শরিফে এসেছে, 'হালাল রিজিকের সন্ধান করা অন্যান্য ফরজ ইবাদতের পর অন্যতম ফরজ।' (আল মুজামুল কাবির, হাদিস : ৯৯৯৩)

হালাল খাবার ও মুসলমানদের করনীয়:

(হে নবী! তাদের) বলো, আমার প্রতি যে অহি নাজিল করা হয়েছে, তাতে আমি এমন কোনো জিনিস পাই না, যা কোনো আহারকারীর জন্য হারাম, যদি না তা মৃত জন্তু বা বহমান রক্ত কিংবা শূকরের গোশত হয়। কেননা তা নাপাক। অথবা যদি হয় এমন গুনাহের পশু, যাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা হয়েছে। হ্যাঁ যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে যায়, আর তার উদ্দেশ্য মজা নেওয়া নয় এবং প্রয়োজনের সীমালঙ্ঘন করে না, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা আনআম : ১৪৫)

হালাল খাবার গ্রহণ আর হারাম খাবার বর্জন ইসলামের নির্দেশ। তাই একজন ইমানদারের জন্য হালাল খাবার গ্রহণ ও বর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় বিধান।

মদ ইসলামে হারাম। জুয়ার উপার্জন হারাম। মুসলমানদের এগুলো থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে হবে। প্রতিমার বেদিতে যেসব খাবার রাখা হয় সেগুলোও মুসলমানদের জন্য হারাম। অনেক মুসলমানকে দেখা যায়, ভিন্ন ধর্মের পূজার প্রসাদ খেয়ে থাকে। এটা মুসলমানদের জন্য হালাল নয়।

হালাল পশুর গোশত হালাল হওয়ার জন্য অতিরিক্ত তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা :

১. পশু জীবিত থাকতে গলার দিক দিয়ে জবাই করা,

২. আল্লাহর নামে জবাই করা,

৩. জবাইকারী মুসলমান হওয়া। মুসলমানদের জন্য মৃত পশু হারাম। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা পশুও হারাম। জবাইকারী যদি অমুসলিম হয় তাহলে সেই গোশতও হারাম।

অমুসলিম দেশে মোড়কবদ্ধ আমদানি করা গোশত যারা খাচ্ছেন, বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকে জবাই করা হয় এমন গোশত খাচ্ছেন; একটু সতর্কতার সঙ্গে তিনটি বিষয় নিশ্চিত হবেন। ১. এটা কীসের গোশত? ২. পশুটা কে জবাই করেছিল? ৩. জবাইয়ের সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা হয়েছিল কি না?

তাছাড়া অমুসলিম দেশে প্রয়োজনীয় যেসব পণ্য কেনা হয় সেই পণ্যের উপাদান ভালো করে দেখে কেনা। উপাদানের মধ্যে হারাম কোন কিছু মিশ্রিত আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে কিনা।

একজন মুসলিমের হালাল খাবার সম্পর্কে সচেতনতা ও সতর্কতা ইমান সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকার প্রমাণ। অমুসলিম দেশে মুসলমানদের এই বিষয়ে আরো বেশি সতর্কতা কাম্য। অতএব, এ বিষয়ে কোনো অলসতা নয়, কোনো অসচেতনতা নয়।

সুপারশপ থেকে মাংস কিনে খাওয়া

অমুসলিম দেশে সুপারশপ থেকে মাংস কিনে খাওয়ার বিধান

মুসলমানদের যেকোনো গোশত খাওয়ার অনুমতি নেই। দুই শর্তে মুসলিম গোশত খেতে পারে। প্রথমত পশু-পাখি হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়ত জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে। তবেই সেই গোশত মুসলমানদের জন্য খাওয়া জায়েজ। কোনো হালাল পশুও জবাইয়ের সময় যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া না হয়, সেই গোশত মুসলমানদের খাওয়া জায়েজ নেই। এমনকি মুসলিম রেস্টুরেন্টেও ‘যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম না নেওয়া হয়, তাহলে জন্তুটি মৃত (অর্থাৎ মৃত পশুর হুকুমের মতো), তা খাওয়া যাবে না। তবে যদি ভুলবশত (আল্লাহর নাম) ছেড়ে দেয়, তাহলে খাওয়া যাবে।’ (আল বিনায়াহ খ: ১০ পৃ-৬৪৫)

পবিত্র কোরআনের দলিল—وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ অর্থ: ‘যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ।’ (সুরা আনআম: ১২১)

হাদিস শরিফে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে ওহি নাজিল হবার আগে জায়েদ ইবনু নুফাইল এর সঙ্গে ‘আসফালি-বালদাহ’ নামক স্থানে

সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁর (স.)-এর সামনে দস্তরখান বিছানো হয়। (যেখানে কিছু পাকানো গোশতও রাখা হয়) রাসুল (স.) তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর বলেন, আমি সে প্রাণী খাই না, যা তোমরা মূর্তির নামে জবাই করো। আমি শুধু ওই প্রাণীই ভক্ষণ করি যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে। (সহিহ বুখারি: ৩৮২৬, ৩৬১৪)

তবে, যদি আপনার জানা থাকে যে জবাইকৃত পশুটি হালাল এবং ওই পশুটি বিসমিল্লাহ বলে জবাই করা হয়েছে তাহলে আপনি অমুসলিম দেশের সুপারশপ থেকেও গোশত ক্রয় করে খেতে পারেন। এরপরও সবচেয়ে উত্তম হবে যদি আপনি নিজে পশু-পাখি ক্রয় করে এনে নিজেই জবাই করতে পারেন। বস্তুত সতর্কতার মাধ্যমেই ব্যক্তির ঈমান ও আমল রক্ষা পায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে সন্দেহজনক জিনিস থেকে বেঁচে থাকবে সে নিজের দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা করবে।' (বুখারি: ৫২)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'কোনো বান্দা ততক্ষণ আল্লাহভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হয় না, যতক্ষণ না সে হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে বৈধ জিনিসও পরিহার করে।' (ইবনে মাজাহ: ৪২১৫) অন্য হাদিসে এসেছে,' যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হলো, সে হারামে পতিত হলো।' (বুখারি, মুসলিম, মেশকাত: ২৭৬২)

উল্লেখ্য, মুসলিম রেস্টুরেন্ট কিংবা সুপারশপ থেকে যাচাই-বাছাই ছাড়াই গোশত কিনে খাওয়া বৈধ। কেননা ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি হলো মুমিনের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে। এরই অংশ হিসেবে মুসলিম হোটেলগুলো থেকে গরু, খাসি বা মুরগির গোশত কিনে খেতে কোনো সমস্যা নেই। তবে যদি কোনো হোটেলের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে, সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছাড়াই জবাই করা হয় বা অমুসলিম কর্তৃক জবাই করা হয়, তাহলে সেখানকার গোশত খাওয়া কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। (রদ্দুল মুহতার : ৬/২৯৯, ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া: ১৭/৪০১, আহসানুল ফতোয়া: ৮/১০৬)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে পশু-পাখি জবাইয়ের বিধানসহ ইসলামের সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে আদায় করার তাওফিক দান করুন। মুসলিম উম্মাহর ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করুন। আমিন।

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

সংস্কৃতির পরিচয়

'সংস্কৃতি' শব্দটি মূলত সংস্কৃত ভাষার শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'কালচার'। যার অর্থ কর্ষণ করা। আর আরবি প্রতিশব্দ হলো, 'আস সাকাফাহ।' সাকাফাহ শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা, জানা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া। পরিশীলিত, প্রশিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুসাক্কাফ' বা সংস্কৃতিবান। আর সংস্কৃতি শব্দটি গঠিত হয়েছে 'সংস্কার' শব্দ থেকে। যার অর্থ শুদ্ধি, পরিমার্জন, মেরামত, ভুল সংশোধন। সুতরাং সংস্কৃতি অর্থ হলো, সংস্করণ, বিশুদ্ধকরণ, অনুশীলনলব্ধ দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন।

পরিভাষায় বিশ্বাসলব্ধ মূল্যবোধে উদ্ভাসিত, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত মন- মানসিকতাকেই সংস্কৃতি বলা হয়।

সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় সংস্কৃতি হলো—জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নিয়ম-নীতি, সংস্কার ও অন্যান্য দক্ষতা যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করে। অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো মানুষের আচরণের সমষ্টি।

ইসলামি সংস্কৃতি

ইসলামি সংস্কৃতি হলো ইসলামের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মানুষ তার আচার-ব্যবহার, দেহ, মন ও আত্মাকে যেভাবে সংস্কার ও সংশোধন করে, তাই ইসলামি সংস্কৃতি।

ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি

ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো সংস্কৃতিকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা যাবে না। ইসলামি সংস্কৃতি কোনো ভাবেই কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক সংস্কৃতি গ্রহণ করে না।

ইসলামি সংস্কৃতি কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত উৎসব ব্যতীত অন্য কোনো উৎসব গ্রহণ করে না। যেমন মুসলমানদের উৎসব মাত্র দুটি ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহা।

ইসলামি সংস্কৃতি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এক থাকে, কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না।

ইসলামি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামি সংস্কৃতি মহান আল্লাহর তাওহিদ ভিত্তিক সংস্কৃতি, অর্থাৎ যে সংস্কৃতিতে আল্লাহর সাথে শিরকের কোনো ছোঁয়া থাকবে না।

ইসলামি সংস্কৃতির মূলনীতি ও মূল্যবোধ বিশুদ্ধ, যথার্থ, মহান ও সার্বজনীন। অর্থাৎ এটি এমন এক সংস্কৃতি যার মূলনীতি এতই বিশুদ্ধ, যাতে সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। আর এটি এমন একটি সার্বজনীন সংস্কৃতি যা কোনো দেশ, জাতি, ভাষা, বর্ণে সীমাবদ্ধ নয়।

এই সংস্কৃতি সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং বিবেক ও জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইসলামি সংস্কৃতি একটি মানবকল্যাণমূলক সংস্কৃতি। এতে রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা। মহান আল্লাহর বাণী-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير -

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহভীরু। (সূরা হুজুরাত আয়াত ১৩)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق

আমি উন্নত চরিত্র পূর্ণতাকল্পে প্রেরিত হয়েছি। (আহমাদ,ইবনে বায, হাদিস নং ১৪১৯)

ইসলামি সংস্কৃতি একজন মুসলমানকে আনুগত্যশীল করে তোলে। সে আরও বেশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিহ সুন্নাহ অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করতে তৎপর হয়।

এটি এমন এক সংস্কৃতি যাতে রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। হজরত সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের (জিহ্বার) এবং দুই রানের মধ্যবর্তী স্থানের (লজ্জাস্থানের) জিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো। (বুখারী শরীফ, হাদিস নং ১৯০৯)

সর্বোপরি কথা হলো ইসলামি সংস্কৃতি নৈতিকতা সমৃদ্ধ এবং মানুষের ধর্ম কর্মের সমন্বয়ক।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এমন এক সংস্কৃতি, যাতে কোনো ধর্মের ছোঁয়া নেই, নেই কোনো নৈতিকতা, মানবিকতা ও শালীনতা। এটা ভোগবাদের চিন্তা থেকে উৎসারিত সংস্কৃতি। তাই জীবনকে উপভোগ করার জন্য যেসব আনন্দ-ফুর্তি করার সুযোগ হয়, সেটাই পাশ্চত্য সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি হলো পুঁজিবাদী চিন্তা ও অন্যান্য পার্থিব ভোগ। যার মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্মহীনতা। এই সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নির্বিচারে গ্রহণ করা এবং যারা এর বিপরীতে দাঁড়ায় তাদের অসভ্য ও পশ্চাতপদ গণ্য করা।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ক্ষুদ্র রূপায়ণ

ক. স্যাটেলাইট সংস্কৃতি খ. সিনেমা বা চলচ্চিত্র সংস্কৃতি। গ. অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন সংস্কৃতি। ঘ. সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও মডেলিং সংস্কৃতি। ৬. পার্লার সংস্কৃতি। চ. দিবস পালন/উৎসব সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

১. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মূলত একটি ভোগবাদী সংস্কৃতি, যা মানুষকে সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে সে তার ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং এটি মুসলমানদের আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থেকে বিমুখ করে।

২. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে জীবনের দৃশ্যমান ও আনুভূতিক শিল্পময় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। আর এতে লাগামহীন জীবনযাপনের উলঙ্গতাকে নানাভাবে বর্ণময় করার চেষ্টা করা হয়।

৩. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিভিন্ন উৎসব সাদরে গ্রহণ করে নেয়, ইসলামে যার কোনো ভিত্তি নেই। যেমন থার্টিফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন ডে, এপ্রিল ফুল, বিবাহ বার্ষিকী, জন্মদিন ইত্যাদি উৎসব।

৪. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বংশানুক্রমে অতিবাহিত হতে থাকে। যদিও এর মধ্যে কুফরি কোনো সংস্কৃতি থাকে, তবুও বংশানুক্রমে তার ধারা বজায় থাকে।

৫. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুসলমানদের ইমানি চেতনাকে নষ্ট করে দেয়। যার কারণে সে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। আর অন্য দিকে ইসলামি সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে কেবল আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মুমিনদের জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে। যেখানে অবিশ্বাসী হওয়ার বা কুরআন-হাদিস অনুসৃত জীবনযাপনের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অন্য জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য ধারণ করল, সে তাদেরই দলভুক্ত হলো। (আবু দাউদ হাদিস নং ৪০৩১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন প্রকারের লোক আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত। যথা-

১. হারাম শরিফের পবিত্রতা বিনষ্টকারী।
২. ইসলামে বিজাতীয় রীতি-নীতির (সংস্কৃতির) প্রচলনকারী।
৩. কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রচেষ্টাকারী।
(বুখারী শরীফ)

মুসলিম-অমুসলিমের সহাবস্থানের বিধান

রাসূল ﷺ যে পথ দেখিয়েছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয়, সামাজিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন এবং অনৈসলামিক সংস্কৃতি থেকে মুসলিম সমাজকে নিরাপদ রাখা আবশ্যক। এজন্য কোনো অনৈসলামিক রাষ্ট্রে সুযোগ থাকলে মুসলিমদের আলাদা অঞ্চলে ইসলামি ধাঁচে চলা ও বংশরক্ষার জন্য একে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এমনটা না হলে প্রয়োজনে যেখানে সম্ভব সেখানে বসবাসের সুযোগ রয়েছে।

মিশ্রিত আবাসস্থলে থেকে ইসলামি চরিত্র ও কীর্তি দিয়ে অমুসলিমদের প্রভাবিত করাটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।
প্রথমত, এখন সে পর্যায়ের উন্নত চরিত্রের অধিকারী মুসলিম সাধারণভাবে নেই, যাঁদের দ্বারা অমুসলিমদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারত। আল্লামা ইকবালের ভাষায় মুসলিমদের অবস্থা আজ এমন:

وضع میں تم ہو نصاری تمدن میں تو ہنود یہ
مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

ভূষণে তোমরা নাসারার মতো, চালচলনে হিন্দুপ্রায়-
মুসলিমের আজ এমন হাল, ইয়াহুদিরাও লজ্জা পায়।

তাই এমন মুসলিমদের থেকে ইসলামের খিদমত আশা করা যায় না। এ অবস্থায় মুসলিমদের আলাদা ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়া আরও বেশি জরুরি, যেন ইসলাম ও পূর্বসূরিদের দুর্নাম না হয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি চরিত্র ও সভ্যতা থেকে অমুসলিমদের প্রভাবিত করার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল সাহাবিদের যুগে। কিন্তু তখনো মুসলিমদের চালচলন যেন অমুসলিমদের চেয়ে নিশ্চিতভাবে আলাদা থাকে, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, শরিয়তের নীতি হলো:

ِدفعُ الْمَضَرَّةِ خَيْرٌ مِّنْ جَلَبِ الْمَنْفَعَة
ক্ষতি দূর করা লাভ করার চেয়ে অগ্রগণ্য।

একই ভূখণ্ডে যদি মুসলিম ও অমুসলিম বাস করে এবং ইসলামি চালচলনের দ্বারা অমুসলিমদের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে উলটো অনৈসলামিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা যেন না থাকে। ভারতের মতো দেশে ফিতনার সময়ে মুসলিমদের সুরক্ষিত থাকাটা সহজ ব্যাপার নয়। দাঙ্গা বাধলে সাম্প্রদায়িক কোনো বিভেদ গোপন রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, অথচ তা গোপন রাখা জরুরি।

বর্তমানে নির্বাচনের সময় মুসলিম প্রার্থীকে ভীষণ বেকায়দায় পড়তে হয়। মিশ্র-বসতি রয়েছে এমন এলাকায় কোনো মুসলিম প্রার্থীর জন্য জয় তো দূরের কথা, প্রার্থিতা করাও কঠিন। এমন ক্ষেত্রে আলাদা বসতি থাকলে মুসলিমদের প্রার্থীর ভালো অবস্থানে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

উপযুক্ত কারণগুলো মাথায় রেখে আমি বলব, মুসলিমদের যদি আলাদা আবাসস্থল থাকে, সম্ভব হলে সেখানে বসবাসকে পছন্দের শীর্ষে রাখা উচিত। আর এমন না হলে মিশ্র-বসতির এলাকায় বসবাস মুসলিমদের জন্য অবৈধ নয়। বরং ঠিকভাবে ইসলাম পালন করা মুসলিম মিশ্র-বসতির এলাকায় থাকলে আশা করা যায় যে, সচ্চরিত্র দ্বারা অমুসলিমদের প্রভাবিত করা যাবে। সাহাবিদের জীবনচরিত এর বড় দৃষ্টান্ত।

রাসুল-এর ইনতিকালের পর অধিকাংশ সাহাবি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম প্রচারের জন্য ছড়িয়ে পড়েন। অমুসলিমদের মধ্যে থেকে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ চালিয়ে যান, তাদের সঙ্গে সম্পর্কও গড়ে তোলেন। ইসলামি জীবনবিধান অনুসারে তাদের প্রভাবিত করেন। সাহাবিদের পর ওলি-আউলিয়া ও পির-মাশায়েখ এ পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যান। এ পদ্ধতি আদর্শ মুসলিমের জন্য অনুসরণীয়, সাধারণ মুসলিমের জন্য নয়।

অমুসলিমদের দেয়া সাধারণ খাবার ও উপহার

রাসুলুল্লাহ (সা.) অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। তাদের রান্নাকৃত খাবার খেয়েছেন। তাদের দেওয়া উপহারও গ্রহণ করেছেন। (বুখারি, হাদিস: ২৬১৫)

অমুসলিমদের রান্না করা খাবার যেমন: মাছ, তরকারি ইত্যাদি খাওয়া জায়েজ। তবে খাবারটি কোনোভাবেই হারাম না হতে হবে। পাশাপাশি তাতে হারাম কোনো কিছুর সংমিশ্রণ না থাকতে হবে। (তাদের কোনো উপাস্যের জন্ম উৎস্বর্গকৃত না হতে হবে)

আবু হুমাইদ আল-সাঈদি (রা.) বলেন, 'আমি নবী (সা.)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধ করেছি। আয়লা-র বাদশাহ নবী (সা.)-কে সাদা রঙের একটি খচ্চর এবং একটি চাদর উপহার দিয়েছেন। (বুখারি, হাদিস: ২৯৯০)

আল-আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব হুনাইনের দিন সম্পর্কে বলেন, 'রাসুল (সা.) সাদা রঙের একটি খচ্চরের উপর ছিলেন; যে খচ্চরটি ফারওয়া বিন নুফাছা আল-জুযামি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। ' (মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৫)

আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.)-কে দুমাত-এর (একটি স্থান) উকাইদির (রাজা) একটি রেশমী কাপড় উপহার দিয়েছেন। তখন তিনি সেটা আলী (রা.)-কে দিয়ে বললেন: 'এটাকে কেটে খিমার (নারীর অবগুণ্ঠন) বানিয়ে ফাতেমাদের দাও। ' (বুখারি, হাদিস: ২৪৭২; মুসলিম, হাদিস: ২০৭১)

ইমাম শারফ আন-নববী বলেন, 'এ হাদিসে কাফেরের হাদিয়া গ্রহণ বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল রয়েছে। ' (শারহু মুসলিম: ১৪/৫০)

আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদি নারী (সা.)-এর কাছে একটি বিষযুক্ত ভেড়া নিয়ে আসে। তিনি সে ভেড়া থেকে খেয়েছেন। (বুখারি, হাদিস: ২৪৭৪; মুসলিম, হাদিস: ২১৯০)

সৌদি আরবের স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে এসেছে, 'অমুসলিমেরা সাধারণ উপলক্ষগুলোতে যেমন- নতুন শিশুর জন্ম ও অন্যান্য উপলক্ষে মুসলিমদের যেসব মিষ্টান্ন দেয়, সেগুলো খাওয়া জায়েজ; তবে ধর্মীয় উপলক্ষকেন্দ্রিক কোনো খাবার খাওয়া জায়েজ নয়।

নবী (সা.) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, 'তিনি মুশরিকদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করেছেন। ' শাইখ আবদুল আজিজ ইবনে বাজ, শাইখ আবদুল আজিজ আলে শাইখ, শাইখ বকর আবু যায়েদ। (ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা, আল-মাজমুআ আস-সানিয়া: ১০/৪৭০)

শাইখ বিন উছাইমিন (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আমার একজন অমুসলিম প্রতিবেশী আছে। কখনও কখনও বিভিন্ন উপলক্ষে সে আমাকে খাবার ও মিষ্টান্ন পাঠায়। এ খাবার আমি খাওয়া ও আমাদের বাচ্চাদের খাওয়ানো কি জায়েজ হবে?

জবাবে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। যদি আপনি নিরাপদ মনে করেন, তাহলে কাফেরের দেওয়া হাদিয়া খাওয়া আপনার জন্য জায়েজ। কেননা নবী (সা.)-কে যে ইহুদি নারী ভেড়া হাদিয়া দিয়েছে এবং তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন। যে ইহুদি তাকে তার ঘরে দাওয়াত করেছে, তিনি তার দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং তার খাবার খেয়েছেন।

তাই কাফেরদের উপহার ও তাদের বাসায় খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে- নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। যদি কোনো আশংকা থাকে, তাহলে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে আরেকটি শর্ত হচ্ছে, খাবার ও উপহারগুলো তাদের ধর্মীয় উপলক্ষ কেন্দ্রিক না হওয়া (যেমন- পূজা ও বড়দিন পালন ইত্যাদি ধরনের কোনো উপলক্ষ)। এই ধরনের অবস্থায় উপলক্ষকেন্দ্রিক তাদের উপহার গ্রহণ জায়েজ নেই। (ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব: ২৪/২)

অমুসলিমদের তাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করলে ঈমান-আমলের ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকলে অংশগ্রহণ করা জায়েজ হবে না। (আহকামুজ জিম্মাহ: ১/৭২৩)
অনুরুপভাবে তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৭৩)

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময় করা অথবা সেখানে অংশগ্রহণ করার বিধান

অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় ও তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে তাদের বাতিল ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করা হয়, যা হারাম।

আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং এমন ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (আলে ইমরান ৩/৮৫)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)।

তিনি বলেন, যে আমাদের ব্যতীত অন্যদের রীতি- নীতির অনুসরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় (তিরমিযী হা/২৬৯৫, মিশকাত হা/৪৬৪৯)।

তিনি আরো বলেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে (ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫২, আবুদাউদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬)। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, কাফেরদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে উপহার বিনিময়, মিষ্টান্ন বিতরণ, রকমারি খাদ্য তৈরী করা, কাজ বন্ধ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য হারাম (মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩/৪৬)

মুসলমানদের অনুষ্ঠানে অমুসলিমদের অংশগ্রহণ

ইসলামি আচার-অনুষ্ঠান যেমন ইদ, রমজানের ইফতার ইত্যাদিতে অমুসলিমদের অংশগ্রহণ করা জায়িজ কি না, এ ব্যাপারে ফকিহদের বক্তব্যে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। তবে কুরবানির গোশতের ব্যাপারে তাঁরা বলেছেন, এটা অমুসলিমদের দেওয়া যাবে।

ইমাম গাজালি রাহ, হাসান বসরির মত বর্ণনা করে বলেন, তিনি প্রতিবেশী ইয়াহুদি বা নাসারাদের কুরবানির গোশত খাওয়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। (ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ২/২৩৩)

এর ওপর অনুমান করলে মনে হয়, যদি অমুসলিমদের জন্য ইফতার বা ইদের ভোজসভায় পানাহারের পৃথক ব্যবস্থা করা হয় এবং মুসলিমদের সঙ্গে মেশানো না হয়, তাহলে এর অবকাশ আছে।

ইফতার ইত্যাদির সময় অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। এটি ইবাদতেরই অংশ। এমন মুহূর্তে কুফরির সংস্পর্শ থেকে কেনো না কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে। তাই সেদিকে লক্ষ রাখা জরুরি।

এ বর্ণনা থেকে এটাও অনুমিত হয় যে, অমুসলিমদের পক্ষ থেকে যে ইফতার পার্টি করা হয়, তাতে অংশ নেওয়া মূলত নাজায়িজ নয়, তবে এর দ্বারা ইফতারের পবিত্র উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য তা মাকরুহ, আর প্রায়শ এমনটা করা গুনাহের কাজ বটে।

অমুসলিমদের সালাম দেয়ার বিধান

সালাম ইসলামের সৌন্দর্য, একজন মুসলিম ভাইয়ের উপর অপর মুসলিম ভাইয়ের হক ও অধিকার। সুতরাং সালাম শুধু এক মুসলিম ভাই আরেক মুসলিম ভাইকেই দিতে পারবে। কোনো অমুসলিমকে সালাম দেওয়া যাবে না। এ মর্মে

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন
لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام
তোমরা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের প্রথমে সালাম দেবে না।' (মুসলিম ২১৬৭)

তবে কোনো অমুসলিম আগে সালাম দিয়ে ফেললে উত্তরে 'অয়া আলাইকুম' বলবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
إذا سلم عليكم أهل الكتابفقولوا وعليكم 'আহলে কিতাবগণ তোমাদের সালাম দিলে, তার উত্তরে তোমরা শুধু 'অয়া আলাইকুম' বলবে।' (বুখারি ৬২৫৮ মুসলিম ২১৬৭)

ফকিহরা অমুসলিমকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সালাম দেওয়া জায়িজ নয়। কোনো কোনো ফকিহ একে কুফরি পর্যন্ত বলেছেন। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে সালাম দেওয়া যেতে পারে। তাতে এমন বাক্য ব্যবহার করতে বলেছেন, যা দ্বারা তার প্রতি সম্মান দেখানো হয় না। যেমন:

اسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

অর্থ:যে সৎ পথ অনুসরণ করে, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

(ফাতাওয়ায়ে শামি: ৯/৫৯০; আল-বাহরুর রায়িক: ৮/৩৭৪; ফাতাওয়ায়ে বাজ্জাজিয়া: ৬/৩৫৫; ফাতওয়া হিন্দিয়া: ৫/৩২৫)

কোনো অমুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ হলে সৌজন্য প্রদর্শনস্বরূপ তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে বা অন্য কোনভাবে যেমন, হাতের দ্বারা ইশারা করে কুশল বিনিময় করার অবকাশ রয়েছে। তাকে ‘আদাব’ও বলা যেতে পারে। তবে কোনভাবেই তাকে ‘নমস্কার’ বা ‘নমস্তে’ বলা যাবে না। (রহীমীয়া ৬/১২৬ কিফায়াতুলমুফতী ৯/১০৬) কেননা, নমস্কার’ বা ‘নমস্তে’ শব্দটি হিন্দুদের বিশেষ সম্ভাষণবাচক শব্দ। সুতরাং এ শব্দ বলে কোনো হিন্দুকে সম্ভাষণ করা যাবে না। (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ১/৫৪)

অমুসলিম ব্যক্তির হাঁচির বিধান

অমুসলিম ব্যক্তির হাঁচির উত্তরে মুসলিমদের উত্তরের মতো ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বলবে না। বরং অমুসলিম ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বললে তদুত্তরে বলবে ‘ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ বা-লাকুম’
يَهْدِيَكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ
(অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন ও তোমার অবস্থা ভালো করুন) বলবে। (ফাতহুল বারী : ১০/৬০৪, উমদাতুল কারি : ২২/২২৬)

মসজিদ নির্মাণ কাজে অমুসলিমদের সহযোগিতা

মসজিদের যে কোনো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সবার আগে যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে তা হলো- মসজিদ আল্লাহর ঘর। অতি পবিত্র জায়গা। এমন কোন আচরণ-উচ্চারণ, কাজ-কর্ম করা যাবে না যাতে করে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। সেই হিসেবে-

১ হারাম পথে উপার্জিত একটি পয়সাও মসজিদের জন্য গ্রহণ করা যাবে না। যিনি দান করছেন তার ভাব-গতি দেখে যদি নিশ্চত হওয়া যায়, দাতার মাঝে ইখলাসের অভাব আছে কিংবা জাগতিক কোনো উদ্দেশ্য অথবা স্বার্থ লুকিয়ে আছে- এমন ব্যক্তির হালাল পয়সাও মসজিদের জন্য নেওয়া জায়েজ নেই বলে মনে করেন অধিকাংশ ফকিহ।

২. অমুসলিমদের দানের ব্যাপারে ফকিহদের বক্তব্য হলো, মসজিদের প্রয়োজনে অমুসলিমদের থেকে সহযোগিতা চাওয়া মসজিদের মর্যাদার খেলাফ। একান্তই বাধ্য না হলে অমুসলিমদের কাছে মসজিদের জন্য সাহায্য চাওয়া উচিত নয়।

৩. অমুসলিমরা যদি স্বেচ্ছায় মসজিদে দান করতে চায় এবং তারা যদি এটিকে ভালো কাজ মনে করে তাহলে তাদের সহযোগিতা নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রে দেখতে হবে, এমন ব্যক্তির আয়ের উৎস সুস্পষ্ট কোনো হারামের সঙ্গে জড়িত কিনা। যেমন তিনি মূর্তি অথবা মদের ব্যবসা কিংবা রাষ্ট্রকর্তৃক অবৈধ কোনো ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করেছেন কি না ইত্যাদি। কেননা এমন ব্যক্তির দান মসজিদের জন্য নেওয়া জায়েজ নেই। কোন মুসলিমও যদি এ দোষে দোষী হয়- তার দানও মসজিদের জন্য নেওয়া জায়েজ নয়।

এছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

১- এরকম দান তাদের বিশ্বাস অনুপাতে পূণ্যের কাজ হতে হবে।

২- পরবর্তীতে অর্থ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য চেষ্টা ফিকির করবে না এ নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৩- অর্থদানের পর মসজিদে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা না করার নিশ্চয়তা না করতে হবে।

৪- অর্থদানের পর মসজিদটি তার দানের টাকায় বলে মুসলমানদের ঠাট্টা-অপমান করার মানসিকতা না থাকতে হবে।

উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে মসজিদ বা ঈদগাহে অমুসলিমের দানকৃত টাকা বা ওয়াকফকৃত সম্পদ নেয়া জায়েজ আছে।

(আদদুররুল মুখতার, ২য় খন্ড; বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খন্ড; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ৬ষ্ঠ খন্ড)

অমুসলিমকে দিয়ে মসজিদ নির্মাণ

মসজিদ আল্লাহর ঘর। এজন্য উত্তম হচ্ছে কোনো মুসলমান মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করানো। তবে অমুসলিম মিস্ত্রি দিয়ে মসজিদ কিংবা ইসলামিক কোনো অনুষ্ঠানের কাজ কারানো জায়েজ আছে। এবং এই কাজের বিনিময় দেওয়াও বৈধ।

(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৭/৪৯৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৫৬)

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ইসলামের নির্দেশনা

অমুসলিম সমাজে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির নানা পেশার নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। লেনদেন ওঠাবসা চলাফেরা সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমানের সাক্ষাৎ হয়। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী।
অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্যতা রক্ষা করে চলতে ইসলাম নির্দেশনা দেয়।

হাদীসে এসেছে, হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও হযরত কায়েস ইবনে সাদ রা. একদিন বসা ছিলেন। তারা তখন কাদিসিয়ায় থাকেন। পাশ দিয়ে একটি লাশ নেয়া হচ্ছিল। তা দেখে তারা দুজনই দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে জানাল, 'এ এক অমুসলিমের লাশ।' তাঁরা তখন শোনালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়েও একবার এক লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি যখন তা দেখে দাঁড়ালেন, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, এ তো ইহুদির লাশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أليست نفسا অর্থাৎ 'সে মানুষ ছিল তো?' -সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩১২

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার জন্যে ইসলাম যে উদার নির্দেশনা দেয়, উপরোক্ত হাদীসটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

হযরত উমর রা.-এর একটি ঘটনা। তিনি তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। একদিন এক ইহুদি বৃদ্ধকে দেখলেন মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে। তখন তিনি ইহুদিকে লক্ষ করে বললেন,

مَا أَنْصَفْنَاكَ إِنْ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِي شَبِيبَتِكَ، ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِي كِبَرِكَ. قَالَ: ثُمَّ أَجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْلِحُه

আমরা তোমার ওপর ইনসাফ করতে পারিনি যদি তোমার যৌবনে আমরা তোমার নিকট থেকে জিযয়া গ্রহণ করে থাকি আর তোমার বার্ধক্যে তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেই। এরপর তিনি তার জন্যে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। -কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে যানজূয়াহ্, ১/১৪৩, হাদীস ১৭৯

হযরত উমর রা. বৃদ্ধ ইহুদির জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন- এটা তো তিনি শাসক হিসেবে করতেই পারেন। কিন্তু তিনি সেই ইহুদিকে লক্ষ করে যে কথাটি বললেন, তা আমাদের সামনে চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। যে সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন এটাই ইসলামের সৌন্দর্য ও আসল চরিত্র।

অমুসলিমদের সাথে সুন্দর ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ রক্ষার শিক্ষাপ্রদানের পাশাপাশি ইসলাম তাকিদের সাথে বারবার এ নির্দেশও দিয়েছে- 'কোনো মুসলমান যেন কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।' এবং এ তাকিদও করেছে, সৌজন্য ও উদারতার নামে যেন নিজেদের দ্বীনদারি আক্রান্ত না হয়। দ্বীনের বিষয়ে আপোস করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। এমনিভাবে সদাচরণের ক্ষেত্রে কোনো অমুসলিমকে মুসলিম ভাই থেকে প্রাধান্য দেওয়াও বৈধ নয়।

অমুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সূরা মুমতাহিনার এই নির্দেশনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য-

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ

তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদের তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা জালিম। -সূরা মুমতাহিনা : ৮-৯

শরীয়তের সীমারেখায় থেকে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে যেমন অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তেমনি এ আচরণটুকুও অনেক সময় দাওয়াতের ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন মহানুভব আচরণে মুগ্ধ হয়েও তো অনেকেই ইসলাম কবুল করেছেন এবং পরবর্তীতেও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে যারাই ইসলামের সুন্দর আচারগুলো নিজেদের মাঝে লালন করে গেছেন, তাদের আচরণই নীরবে অমুসলমানদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছে। অনেক অমুসলিম এতে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে এবং আশ্রয় নিয়েছে ইসলামের শীতল ছায়ায়।

পর্দা

শরিয়তের পরিভাষায়, নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মধ্যে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা। পর্দা-বিধান ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে সমাজ-ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে উম্মতের মায়েদের জন্য অনেক বড় ইহসান। এই বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দলিল। পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক এবং ইফফাত ও পবিত্রতার একমাত্র উপায়।

অনেকে মনে করেন, পর্দা-বিধান শুধু নারীর জন্য। এ ধারণা ঠিক নয়। পুরুষের জন্যও পর্দা অপরিহার্য। তবে উভয়ের পর্দার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যে শ্রেণীর জন্য যে পর্দা উপযোগী তাকে সেভাবে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই কুরআন-সুন্নাহর পর্দা সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এই বাস্তবতা স্বীকার করবেন যে, ইসলামে পর্দার বিধানটি অন্যান্য হিকমতের পাশাপাশি নারীর সম্মান ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই দেওয়া হয়েছে। এজন্য এই বিধানের কারণে প্রত্যেককে ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কৃতঘ্ন হয়ে এ বিধান সম্পর্কে অযথা আপত্তি করা উচিত নয়।

আকবর এলাহাবাদী বলেন-

প্রাশ্চাত্যের ও প্রাশ্চাত্য প্রভাবিত পুরুষদের অন্তরে পর্দা পড়ে যাওয়ার কারণে তারা এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে না পারলেও আজকের পশ্চিমা নারীরা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারছে। আর এই বিধানটিই তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মাধ্যম হয়েছে।’

আমি পূর্বেই বলেছি, নারী-পুরুষ উভয়ের পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায় হল ইসলামের পর্দা বা হিজাব বিধান। এই বিধানের অনুসরণের মাধ্যমেই হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। পর্দার এই সুফল স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِن

এই বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (সূরা আহযাব (৩৩) : ৫৩)

সুতরাং মানবসমাজকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দা-বিধানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারীজাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দা-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ এখন সময়ের দাবি।

নারীর মুখমণ্ডলসহ পূর্ণ পর্দা

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯)

وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَاب

তোমরা তাঁদের (নবী পত্নীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। তোমাদের কারো জন্য আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ। (সূরা আহযাব (৩৩) : ৫৩)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নারীর দেহের কোনো অংশই পর্দা-বিধানের বাইরে নয়। উম্মুল মুমিনীনগণের আমলও তা প্রমাণ করে।
এই আয়াতে যখন পর্দার বিধানকে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মুল মুমিনীনদের জন্যও অধিকতর পবিত্রতার উপায় বলা হয়েছে তখন উম্মতের আর কে আছে যে এই বিধানের বাইরে থাকতে পারে?

وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِن

তরজমা : তারা যেন গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। ... (সূরা নূর : ৩১)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন,

يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله : وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مورطهن فاختمرن بها.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রথম শ্রেণীর মুহাজির নারীদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ তাআলা যখন

وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِن

আয়াত নাযিল করলেন তখন তারা নিজেদের চাদর ছিঁড়ে তা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করেছিলেন।-সহীহ বুখারী ২/৭০০

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন-‘ফাখতামারনা’ অর্থ তারা মুখমন্ডল আবৃত করেছেন।-ফাতহুল বারী ৮/৩৪৭

আল্লামা আইনী রাহ. বলেন-‘ফাখতামারনা বিহা’ অর্থাৎ যে চাদর তারা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন তা দিয়ে নিজেদের মুখমন্ডল আবৃত করলেন। (উমদাতুল কারী ১৯/৯২)

আল্লামা শানকীতী রাহ. বলেন, এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, উপরোক্ত মহিলা সাহাবীগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুখমন্ডল আবৃত করারও আদেশ করেছেন। তাই তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনার্থে নিজেদের চাদর ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমন্ডল আবৃত করেছেন।

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

তরজমা : (হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর : ৩১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ‘সাধারণত যা প্রকাশিত’ অর্থ হচ্ছে কাপড়।-তাফসীরে তাবারী ১৮/১১৯

এই ব্যাখ্যা অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর মুখমন্ডলসহ পূর্ণ দেহ আবৃত রাখা অপরিহার্য।

পুরুষের পর্দা

পর্দা ইসলামের একটি অবশ্যকরণীয় বিধান। পর্দাহীনতার কারণে সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে। চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটে। পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়। পরকীয়ার সৃষ্টি হয়ে তালাকের মতো নিকৃষ্ট ঘটনাও ঘটে। সর্বোপরি পর্দার বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ও রাসুল (স.)-এর অবাধ্য হিসেবে গণ্য হয়।

পর্দার বিধান নারীদের জন্য যেমন ফরজ, তেমনি পুরুষদের জন্যও। যারা মনে করেন 'পর্দা শুধু নারীরা পালন করবে, পুরুষদের আবার পর্দা কিসের?' তাদের ধারণা ভুল। তবে নারীর পর্দা ও পুরুষের পর্দার ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে। নারী বাইরে বেরুলে বোরকা-চাদর ইত্যাদির মাধ্যমে তার শরীর ঢেকে রেখে পর্দা করবে। আর পুরুষ কাপড়ের মাধ্যমে নিজেকে সেভাবে আড়াল করে পর্দা করবে না। তার পর্দা হবে নিজেকে সংযত রাখা, চোখের হেফাজত করার মাধ্যমে। পুরুষ পর-নারীর দিকে তাকাবে না, হুটহাট নারীর ঘরে ঢুকবে না।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণিকে পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন— '(হে নবী!) আপনি ঈমানদার পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ এ ব্যাপারে অবগত। আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাজত করে।' (সুরা নুর: ৩০)

কোরআনের আয়াতটি লক্ষ্য করলে দেখবেন, প্রথমেই পুরুষকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে। ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত কিংবা তাকানোই হচ্ছে যৌন প্রবৃত্তির সূচনা এবং এর শেষ পরিণতি পাপ ও ফেতনাসহ জিনা-ব্যভিচার, যার পরিণাম ভয়ঙ্কর।

হাদিসে এসেছে, 'বেগানা নারীকে দেখা চোখের ব্যভিচার, তার সঙ্গে বেহুদা বা যৌন উদ্দীপক কথা হলো জিহ্বার ব্যভিচার, যৌন উদ্দীপক কথা শোনা কানের ব্যভিচার, স্পর্শ করা হাতের ব্যভিচার, পায়ের জেনা হলো ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া এবং মনের ব্যভিচার হলো চাওয়া ও প্রত্যাশা করা।' (বুখারি: ৬২৪৩ ও মেশকাত: ৮৬)

বুরায়দা ইবনে আল-হাসিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) আলী (রা.)-কে বলেন, 'হে আলী! দৃষ্টির পর দৃষ্টি ফেলো না। অনিচ্ছাকৃত যে দৃষ্টি পড়ে এর জন্য তুমি ক্ষমা পাবে। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টির জন্য ক্ষমা পাবে না।' (আবু দাউদ: ১/২৯২)

মূল কথা হচ্ছে ইসলামি শরিয়তে পর্দার বিধান শুধু নারীর জন্য প্রযোজ্য নয়, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তেমনই পর্দার বিধান শুধুই ব্যক্তিজীবনের বিষয় নয় বরং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মাহরাম ও গায়রে মাহরাম কারা

ইসলামি শরিয়তে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য গায়রে মাহরামের সঙ্গে পর্দা করা ফরজ। পর্দার সঙ্গে মাহরাম ও গায়রে মাহরামের সম্পর্কের বিষয়টি জড়িত।

নারী-পুরুষ পরস্পর যাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ তারা মাহরাম। আর যেসব নারী-পুরুষের দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ নয় বরং হারাম, বাধ্যতামূলক পর্দা করতে হয়; তারা গায়রে মাহরাম।

যেসব নারী-পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোরআনুল কারিমের একটি আয়াতে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাহলো-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ ۫ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَیْنَ الْاُخْتَیْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا

তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজিদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়ীদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোনো পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র (বিয়ে) করা (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা নিসা : আয়াত ২৩)

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মাহরাম এবং গায়রে মাহরাম কারা?

আলাদা আলাদাভাবে নারীর মাহরাম-গায়রে মাহরাম এবং পুরুষের মাহরাম ও গায়রে মাহরমদের পরিচিতি তুলে ধরা হলো-

পুরুষের জন্য মাহরাম : পুরুষরা যেসব নারীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন; তারা হলেন-১. দাদি২. মা/দুধ মা৩. বোন/দুধ বোন৪. শাশুড়ি৫. স্ত্রী৬. মেয়ে/দুধ মেয়ে/সৎ মেয়ে৭. ছেলে/দুধ ছেলের স্ত্রী৮. ফুপু৯. খালা১০. ভাই/বোনের মেয়ে (ভাতিজি/ভাগ্নি)১১. নানি

পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম : পুরুষরা যেসব নারীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন না; তারা হলেন- ১. মায়ের খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুপাতো বোন ২. চাচাতো বোন ৩. ভাবি ৪. বাবার খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুপাতো বোন ৫. চাচি ৬. ফুপাতো বোন ৭. খালাতো বোন ৮. মামাতো বোন ৯. শ্যালক/শ্যালিকার মেয়ে (স্ত্রীর (ভাতিজি/ভাগ্নি) ভাই-বোনের মেয়ে) ১০. শ্বশুর/শাশুড়ির বোন (ফুফু শাশুড়ি/খালাশ শাশুড়ি) ১১. শ্যালিকা (স্ত্রীর বোন) ১২. মামি ১৩. স্ত্রীর খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুপাতো বোন ১৪. স্ত্রীর ভাবি ১৫. মেয়ের ননদ ১৬. ছেলে/মেয়ের শাশুড়ি

নারীর জন্য মাহরাম : নারীরা যেসব পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন, তারা হলেন-১. দাদা ২. বাবা ৩. ভাই ৪. শ্বশুর ৫. স্বামী ৬. ছেলে ৭. নাতি ৮. চাচা ৯. ভাই/বোনের ছেলে (ভাতিজা/ভাগিনা) ১০. নানা ১১. মামা

নারীর জন্য গায়ের মাহরাম : নারীরা যেসব পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন না; তারা হলেন-১. মায়ের খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুপাতো ভাই ২. চাচাতো ভাই ৩. দুলাভাই (বোনের স্বামী) ৪. বাবার খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুপাতো ভাই ৫. ফুফুর স্বামী (ফুফা) ৬. ফুফাতো ভাই ৭. খালাতো ভাই ৮. মামাতো ভাই ৯. ননদের ছেলে ১০. শ্বশুর/শাশুড়ির ভাই (চাচা শ্বশুড়/মামা শ্বশুড়) ১১. দেবর/ভাসুর (স্বামীর ছোট ও বড় ভাই) ১২. ননদের স্বামী (স্বামীর ছোট বোনের স্বামী) ১৩. স্বামীর খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুফাতো ভাই ১৪. স্বামীর দুলাভাই (স্বামীর বড় বোনের স্বামী) ১৫. ছেলের শ্যালক (ছেলের স্ত্রীর ছোট ভাই) ১৬. ছেলে/মেয়ের শ্বশুর ১৭. খালার স্বামী (খালু)

মুসলমানের পোশাক

পোশাক-পরিচ্ছদ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, পোশাক যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা ও সৌন্দর্যের উপকরণ, তেমনি শরীয়তের দিক-নির্দেশনা মেনে তা ব্যবহার আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম, কুরআন-হাদীসে অন্যান্য বিষয়াদির মতো লেবাস-পোশাক বিষয়েও হুকুম-আহকাম দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পোশাক সম্পর্কিত দ্বীনী হেদায়াত ও শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের তরবিয়ত করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামও নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মতো স্ত্রী-কন্যা ও সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত করেছেন। কারণ পোশাক-পরিচ্ছদের ভালো মন্দ মানুষের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, চরিত্র ও নৈতিকতা তথা মানবিক জীবনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং অন্তর ও মন-মানসিকতায় গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই পোশাকের বিষয়টি এ রকম সাধারণ কোনো বিষয় নয় যে, একটি কাপড় কিনলাম এবং তা পরে নিলাম। বরং এক্ষেত্রে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা মেনে চলা জরুরি।

পোশাক যে অনেক বড় নেয়ামত তা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْر

হে আদমের সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দূষণীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও উপকরণ। বস্তুত তাকওয়ার যে পোশাক সেটাই উত্তম। এসব আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্যতম। এর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে উপদেশ গ্রহণ করে।

পোশাকের কিছু মৌলিক নীতিমালা

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান অত্যন্ত যৌক্তিক ও উপকারী। শরীয়ত বিশেষ কোনো পোশাক সুনির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইন বা আকৃতিও বলে দেয়নি যে, এ ধরনের পোশাকই তোমাদের পরতে হবে; বরং বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল, আবহাওয়া ও মৌসুম ভেদে পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে কিছু মৌলিক নীতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এ ধরনের পোশাক গ্রহণীয় ও এ ধরনের পোশাক বর্জনীয়। সুতরাং

মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এসব নীতিমালা ও সীমারেখা মেনে চলা জরুরি। যে পোশাক এই নীতিমালা ও সীমারেখা অনুযায়ী হবে সেটাই শরীয়তসম্মত পোশাক বলে গণ্য হবে।

এক. পোশাক এমন আঁটসাঁট ও ছোট মাপের হতে পারবে না, যা পরলে শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে এবং দৈহিক গঠন ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।

আবু ইয়াযীদ মুযানী রাহ. বলেন, হযরত ওমর রা. মহিলাদেরকে কাবাতী (মিসরে প্রস্তুতকৃত এক ধরনের সাদা কাপড়) পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা বলল, এই কাপড়ে তো ত্বক দেখা যায় না। তিনি বললেন, ত্বক দেখা না গেলেও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ২৫২৮৮

দুই. পোশাক এমন পাতলা ও মিহি হতে পারবে না যাতে শরীর দেখা যায় এবং সতর প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন পাতলা সুতির কাপড়, নেটের কাপড় ইত্যাদি। অবশ্য পাতলা কাপড়ের নিচে সেমিজজাতীয় কিছু ব্যবহার করলে তা জায়েয হবে।

হযরত আলকামা ইবনে আবু আলকামা তার মা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হাফসা বিনতে আবদুর রহমান তার ফুফু উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর নিকটে এল। তখন তার পরনে ছিল একটি পাতলা ওড়না। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন।-মুয়াত্তা মালেক ২/৯১৩, হাদীস : ৬

তিন. পোশাকের ক্ষেত্রে কাফের-মুশরিক ও ফাসেক লোকদের অনুসরণ-অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না। বিশেষত সেইসব পোশাকের ক্ষেত্রে যা অমুসলিমদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'উসফুর' (ছোট ধরনের লাল বর্ণের ফুল গাছ) দ্বারা রাঙানো দুটি কাপড় পরতে দেখে বললেন, 'এগুলো হচ্ছে কাফিরদের পোশাক। অতএব তুমি তা পরিধান করো না।'-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২০৭৭; নাসায়ী, হাদীস : ৫৩১৬

তাছাড়া অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪০২৭

চার. পোশাকের মাধ্যমে অহংকার ও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্য হওয়া যাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুখ্যাতি ও প্রদর্শনীর পোশাক পরবে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬২৪৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪০২৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি অহংকারবশত মাটিতে কাপড় টেনে টেনে চলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৭৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২০৮৭

পাঁচ. পুরুষদের জন্য মেয়েলী পোশাক এবং নারীদের জন্য পুরুষদের পোশাক পরা এবং একে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করা নিষেধ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সব পুরুষের উপর লানত করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে (তাদের মতো আকৃতি, তাদের পোশাক ও তাদের চাল-চলন গ্রহণ করে)। আর সেই সব নারীর উপরও লানত করেছেন, যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারিনী নারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন।-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪০৯২

ছয়. পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় করা, বিলাসিতা করার জন্য বা শখের বশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক ক্রয় করা অথবা মাত্রাতিরিক্ত উচ্চমূল্যের পোশাক ক্রয় করা নিষেধ।

হযরত আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা খাও, পান কর, অন্যদের দান কর এবং কাপড় পরিধান কর যে পর্যন্ত অপচয় ও অহংকার করা না হয়।-সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৫৯; ইবনে মাজাহ,হাদীস : ৩১০৫

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন, যা মনে চায় খাও, যা মনে চায় পরিধান কর যে পর্যন্ত দুটি বিষয় না থাকে : অপচয় ও অহংকার।-সহীহ বুখারী ১০/১৫২

সাত. গায়রে মাহরাম ও পর পুরুষের সামনে অলংকার ও পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না, যাতে তারা সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

তারা যেন নিজেদের ভূষণ প্রকাশ না করে।

উক্ত আয়াতে নারীদেরকে হুকুম করা হয়েছে তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পর পুরুষের সামনে নিজেদের পুরো শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা আবৃত করে রাখে। যাতে তারা সাজ-সজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়।

ইমাম যাহাবী রাহ. বলেন, যে সব কর্ম নারীর উপর লানত করে তা হল অলংকার ও আকর্ষণীয় পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ করা। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার ...। আলকাবায়ের পৃ. ১০২

وَ قَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

নিজ গৃহে অবস্থান কর সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না। যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত।

প্রাচীন জাহেলী যুগে নারীরা নির্লজ্জ সাজ-সজ্জার সাথে নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াত। আজকের নব্য জাহেলিয়াতের অশ্লীলতা এতটাই উগ্র যে, তার সামনে প্রাচীন জাহেলিয়াত ম্লান হয়ে গেছে।

আট. পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় নিষেধ এবং তা কবীর গুনাহ।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাপড়ের যে অংশ টাখনুর নীচে যাবে তা (টাখনুর নীচের অংশ) জাহান্নামে জ্বলবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৭৮৭

হযরত আবু হুবাইব ইবনে মুগাফফাল গিফারী রা. মুহাম্মাদ কুরাশীকে লুঙ্গি টেনে চলতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন-আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে অহংকারবশত পায়ের নীচে কাপড় ফেলে চলবে সে জাহান্নামে গিয়ে এভাবে চলবে।'-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৫৫৪২

তাছাড়া অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪০২৭

হে পথিক

পোশাক হচ্ছে নর-নারীর অঙ্গের ভূষণ এবং লজ্জার আবরণ। আল্লাহ রাববুল আলামীনের নিকট বান্দার পোশাক-শোভিত রূপটিই পছন্দনীয়। তাই বিশেষভাবে ইবাদতের সময় তিনি বান্দাকে আদেশ করেছেন যেন সে পোশাক-সৌন্দর্য গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে শয়তানের কাছে পছন্দনীয় হচ্ছে মানুষের নগ্ন ও বিকৃত রূপ। আর তা হবেই না কেন, সে তো আদম সন্তানের প্রকাশ্য দুশমন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কার পছন্দ গ্রহণ করব-রাহমানের, না শয়তানের?

পোশাকের মানদন্ডে বিচার করলেও বোঝা যায় পশ্চিমা সভ্যতা হচ্ছে শয়তানের প্রতিভূ। আর এ কারণেই পশ্চিমা আদর্শের অনুসারীদের পোশাক দিন দিন সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। প্রথমে পোশাক ছিল হাটুর নীচ পর্যন্ত, এরপর তা উঠে এল হাটুর উপরে। এরপর এল প্যান্ট-ফতুয়া, এল নেটের জামা, এল টাইটস-সর্টস। যেন হাদীসে বর্ণিত 'পোশাক পরিহিতা নগ্ন নারী'র দৃষ্টান্ত একের পর প্রকাশিত হতে লাগল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা বেহেশতের ঘ্রাণটুকুও পাবে না।

বেদনার বিষয় এই যে, এই সব দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মুসলিম-সমাজে। পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের তাহলে কোন দিকে নিয়ে চলেছে?

হে পথিক তুমি যদি হও স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী, তোমার বুকে যদি থাকে মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি তাহলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর ঐসব প্রতারণার প্রলোভন এবং ফিরে এসো সেই পথে, যার শেষে আছে চির শান্তির আশ্রয়।

নামাজ

ঈমানের পরে মুমিন নর ও নারীর উপরে সবচেয়ে বড় ফরজ ইবাদত হলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত সময়মত আদায় করা। কারণ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম একটি হলো নামাজ। এটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, জেনে রাখো, তোমাদের আমালসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নামাজ। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে অজু করে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৭৭)

নামাজ এত শক্তিশালী ইবাদত যে নামাজের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। মানুষ যখন দৈনন্দিন নামাজগুলো ঠিকমতো আদায় করে, তখন নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের সব পাপ মাফ হয়ে যায়।

ইবনে শিহাব (রহ.) বলেন, উরওয়াহ হুমরান থেকে বর্ণনা করেন, উসমান (রা.) অজু করে বলেন, ...আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে কোনো ব্যক্তি সুন্দর করে অজু করবে এবং নামাজ আদায় করবে, পরবর্তী নামাজ আদায় করা পর্যন্ত তার মধ্যবর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(বুখারি, হাদিস : ১৬০)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কারো ঘরের সামনে যদি নহর (প্রবাহিত) থাকে এবং সে যদি তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোনো প্রকার ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, না তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না। রাসুল (সা.) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্তও এরূপ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দ্বারা আল্লাহ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন। (নাসায়ি, হাদিস : ৪৬২)

নামাজের মাধ্যমে বান্দা মহান রবের সঙ্গে কথোপকথন করে। নামাজের মাধ্যমে বান্দার রুহ তাজা হয়। নামাজের মাধ্যমে বান্দা গুনাহমুক্ত হয়। নামাজের প্রতিটি সিজদায় বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রীতক। একজন মুসলিম পৃথিবীর যেই প্রান্তে থাকুক না কেন তার উপর নামাজ পড়া ফরজ। তা অমুসলিম প্রধান দেশেও হোক না কেন। যেসব অমুসলিম প্রধান দেশে আজান দেয়া নিষিদ্ধ সেখানে নামাজের ওয়াক্ত হলে নামাজ পড়ে নিতে হবে। তেমনই কাজের অজুহাতে নামাজ ছাড়া যাবে না। প্রয়োজনে নামাজের সময় কাজে বিরতি নিতে হবে নিয়ে নামাজটা আদায় করতেই হবে। তবুও নামাজ ছাড়া যাবে না।আর কোন কাজে কোম্পানি যদি নামাজের সময় বিরতি না দেয় তাহলে অতিদ্রুত সেই কাজ পরিত্যাগ করতে হবে।

প্রিয়নবী (সা.) বলেন, ‘আমার জন্য গোটা জমিনকে সিজদার স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যেকোনো ব্যক্তি যেখানে থাকুক না কেন নামাজের সময় হলে— সে যেন নামাজ আদায় করে নেয়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩২৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮১০)

অতএব, গোটা পৃথিবী সিজদার স্থান। মুসলিমের জন্য সারা বিশ্বের সব জায়গায় নামাজ পড়া জায়েজ। তবে শরিয়তের দলিল-প্রমাণের কারণে যদি কোনো বিশেষ স্থানকে বাদ দেয়, সেই স্থানগুলো ছাড়া। যেমন- কবরস্থান, গোসলখানা ইত্যাদি।

সন্তান পালন ও দ্বীনি তারবিয়ত

সন্তান মা-বাবার নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত। তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো এবং একজন ঈমানদার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। আজ বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং চাকরি ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলাকেই শুধু দায়িত্ব মনে করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সন্তানকে হালাল ও বৈধ পন্থায় আয়-রোজগার শেখানোও পিতামাতার কর্তব্য। কিন্তু এটিই একমাত্র দায়িত্ব নয়; বরং তাদেরকে ইসলামী সভ্যতা (তাহযীব) শেখানো, দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদি শেখানো এবং একজন দ্বীনদার-নামাযী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদীস শরীফে এসেছে- 'জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।' -সহীহ বুখারী ১/২২২ হাদীস ৮৯৩

সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সদকা জারিয়া তেমনি সন্তান যদি দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে, দুর্নীতি ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে উভয় জগতেই মা-বাবার জন্য বিপদ। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ। আর কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহর ফল ভোগ করতে থাকবে। আখিরাতে এই আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে আপিল করবে যে, তারা আমাকে দ্বীন শেখায়নি। তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।

অমুসলিম দেশে সন্তান

আপনি যদি একটি অমুসলিম দেশে বাস করেন , আপনি হয়তো চাইবেন আপনার শিশু ইসলাম এর প্রতি অনুরক্ত হয়ে / ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠুক। ইসলাম সম্পর্কে জানুক, ইসলাম কে নিজের জীবন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে বেড়ে উঠুক । আপনি যখন আপনার শিশুকে ইসলামিক জীবন যাপন পদ্ধতি (নবী হজরত মুহাম্মদ সাঃ এর জীবন পদ্ধতি / সীরাত) বলতে চেষ্টা করেন, শিক্ষা দিতে প্রয়াস করেন, তা হয়তো আপনার শিশু জন্য অনুধাবন করতে বেশ কষ্ট হয়। যা অমুসলিমদের দেশে সন্তান প্রতিপালনে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ।

বেশির ভাগ সময় শিশু মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে না। মূল কারণ হিসাবে অনৈসলামিক পরিবেশে বেড়ে উঠায় দায়ী। শিশুটি ঘরে এক রকম শিক্ষা পাচ্ছে আর স্কুল, খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র, বাজার (অন্যান্য....) জায়গায় দেখছে সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। অন্য ভাবে বলা যায় , ইসলাম তাকে যে সব জিনিস না করতে বলছে - সে দেখছে তার বন্ধু বান্ধব অনায়াসে সে জিনিস করছে। ছেলে বন্ধু / মেয়ে বন্ধু সম্পর্ক , ছেলে মেয়ে মেলা মেশা , পার্টি উৎসব উল্লাস এ সময় নষ্ট করা , আরো অনেক উদাহরণ আছে।

এ দ্বিমুখী পরিবেশ শিশুদের মনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। সে হারিয়ে ফেলে তার নিজস্ব স্বকীয়তা। কোন সংস্কৃতি সে গ্রহণ করবে। ঠিক এ সময় পিতা মাতার প্রয়োজন খুব বেশি। মারাত্মক ব্যস্তময় জীবন পাশ্চাত্যে , কিন্তু আপনার শিশুকে সঠিক ভাবে বেড়ে উঠার জন্য আপনি কি যথেষ্ট সময় দিচ্ছেন? এ প্রশ্ন পিতামাতা কে।

বাবা মা একটি শিশুর জন্য প্রথম আদর্শ। উপনি একটু সময় নিয়ে চিন্তা করুন কি আদর্শিক মূল্যবোধ কাঠামো আপনি আপনার শিশুর সামনে রাখছেন। আপনি যদি শিশুর সামনে ধুমপান করেন - সে ভাববে ধুমপান ভালো জিনিস, আপনি যদি বিনোদন (টেলিভশন, সিনেমা, আনন্দ উল্লাস) নিয়ে ব্যস্ত থাকেন - শিশু ভাববে সেটা তার জন্য ঠিক। আপনি ভাবছেন বৃদ্ধ বয়সে আপনার সন্তান আপনাকে দেখভাল করবে - আপনি কি আপনার পিতামাতা কে সে রকম দেখভাল করছেন? আপনার শিশু কি সেটা দেখছে? আপনার শিশু কি দেখছে উপনি নামাজ পড়ছেন ? আপনার শিশু কি দেখছে আপনি পর্দা করছেন ? আপনার শিশু কি দেখছে আপনি শালীন আচরণ করছেন ? আপনার শিশু কি দেখছে আপনি কুরআন পড়ছেন? আপনি কিছুই করছেন না, আর আপনি চাচ্ছেন আপনার শিশু নিজে নিজে সব শিখে যাবে?

শিশু যখন ঘরের মধ্যে কোনো আদর্শ কে অনুসরণ করার জন্য পাবে না সে তাকাবে ঘরের বাইরে। একটি অমুসলিম দেশে ইসলামিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হবার জন্য যথেষ্ট উপকরণ ঘরের বাইরে ছড়িয়ে রেখেছে। সুস্থ্য পরিবেশ এবং পিতা মাতার যথেষ্ট পরিচর্চার অভাব এ শিশুর আদর্শিক অবক্ষয় অমুসলিম দেশের মুসলিম ঘরে ঘরে বিরাজ করছে। পূর্ণ বয়োপ্রাপ্তির পর - মুসলিম মেয়ে কে পালিয়ে যেয়ে বিয়ে করতে দেখা যায় ইহুদি নাসারা হিন্দু ছেলেদের।সেরূপ মুসলিম ছেলেদের ও ইসলামের নিষেধ উপেক্ষা করে ইহুদি নাসারা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করতে দেখা যায়। দেখা যায় মদ/মাদক এর পেয়ালা হাতে কোনো উল্লাসে মেতে থাকতে। বিবাহ বহির্ভুত নারী পুরুষ সম্পর্ক তৈরী করতে। কোনো ?? এ বেশির ভাগ

অভিযোগ এর উত্তর কিন্তু হতভাগ্য মুসলিম / মুসলিমাহ (এরা হয়তো আর ইসলাম এর উপর থাকে না) এর শিশুকাল এর ব্যর্থ পরিচর্চা কেই নির্দেশ করে।

সঠিক তারবিয়তের অভাব

আজ যারা কচিকাচা আগামীতে তারাই হবে জাতির কর্ণধার। সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহ তাআলার এক মহা আমানত। এই আমানতের যথাযথ হক আদায় করা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। কিন্তু অনেক মা-বাবাই সন্তানের তালীম-তারবিয়তের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এর মূলে রয়েছে : এক. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সন্তান যে একটি মহা আমানত-এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব। দুই. বিজাতীয় রীতি-নীতি ও ফ্যাশন প্রীতি। তিন. বৈষয়িক উপার্জনকেই জীবনের সাফল্য হিসেবে মনে করা। এ কারণে সন্তানকে একজন ঈমানদার ও সাচ্চা মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ তারা বোধ করেন না। এ সকল মৌলিক চিন্তাগত ভ্রান্তিই সন্তানের তালীম-তারবিয়াতের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। নিচে এই বিষয়য়ে আলোচনা করা হলো।

১.বিজাতীয় রীতিনীতি ও ফ্যাশন প্রীতি

কুরআন-হাদীসের একটি মৌলিক শিক্ষা হল, আচার-ব্যবহার, সাজসজ্জা, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদিতে ইসলামী স্বাতন্ত্রবোধ থাকা। এসব ক্ষেত্রে বিজাতীয় অনুকরণকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এটা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অসংখ্য হেদায়েত রয়েছে।

হাদীস শরীফের 'কিতাবুল আদব' অধ্যায়ে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে বিধর্মীদের অনুকরণ না করার এবং কৃষ্টি-কালচারে তাদের বিরোধীতা করার অনেক তাকীদ এসেছে। একটি হাদীসে এসেছে- 'যে ব্যক্তি কোনো জাতি বা সম্পদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করল সে তাদের অন্তর্ভু&ক্ত।'

সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা, ফ্যাশন ও রীতিনীতিতে বিজাতীয়দের অনুকরণ করা এবং সে অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে তোলা বড় ধরনের ভুল। এতে ইসলাম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন থেকে সে ধীরে ধীরে এমনিভাবে বের হয়ে যায় যার উপলব্ধিও থাকে না।

২.কুরআন মজীদ না শেখানো

একজন মুসলিম তার সন্তানকে আল্লাহর কালাম শেখাবে না এটা কি কল্পনা করাও সম্ভব? কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থাই এই। ভেবে দেখুন, লাখ লাখ টাকা খরচ করে সন্তানের জন্য বড় বড় ডিগ্রী নেওয়া হচ্ছে কিন্তু কুরআন পড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমার একটি অভিজ্ঞতা আপনাদের শোনাই। রমযান মাসের কথা। মাঝবয়সী একজন ভদ্রলোক মসজিদে বসে কুরআন শরীফ খুলে বুক ভাসিয়ে কাঁদছিলেন। নিজেকে কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিলাম না। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, চাচা কী হয়েছে? এ কথা শুনে আরো জোরে কেঁদে উঠলেন। এরপর বললেন, বাবা! আমি তো এই পবিত্র কালাম পড়তে পারি না। আমার জীবন তো শেষ প্রায়। আমার কী হবে। আমার বাবা আমাকে ডাক্তার বানিয়েছেন, কিন্তু কখনও কুরআন পড়াননি।' বলুন তো এ লোকটির পিতা ঐ সময় কবরে থেকে কী পাচ্ছিলেন? ভেবে দেখুন, দুনিয়াতেই অভিযোগ শুরু হয়ে গেছে। এরপর যারা আখেরাতের ভয়াবহ আযাবের মুখোমুখি হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। তাদের অভিযোগ আরো কত কঠিন হবে!! কার বিরুদ্ধে? যে বাবা সন্তান মোল্লা হয়ে যাবে ভেবে কুরআন শেখাননি তার বিরুদ্ধে। শুধু কি তাই? স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ তাআলার দরবারে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। কুরআন মজীদে এসেছে- (তরজমা :) 'রাসূল বলবেন, হে আমার রব, আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে!' (সূরা ফুরকান ৩০)

স্বয়ং কুরআনের অভিযোগ করার কথাও এসেছে। তাই আমাদের অত্যন্ত সচেতন হওয়া কর্তব্য। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত, এ ব্যাপারে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদেরকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানান তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাদেরকে ঈমানদার বানানোও আপনার কর্তব্য। সন্তান কুরআন পড়তে ও বুঝতে পারে এতটুকু যোগ্যতা তার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। তাই শুধু ডাক্তার নয়; বরং দ্বীনদার ডাক্তার ও দ্বীনদার ইঞ্জিনিয়ার বানান। আর যদি দ্বীনের খাদেম আলেম বানাতে পারেন তবে তো সোনায় সোহাগা।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা.এর ছেলে আব্দুল্লাহ, যখন সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছিলেন তখন বাবা খুশিতে উট যবাই করে সমাজের লোকদেরকে দাওয়াত করেছিলেন। আজ আমরাও মিষ্টিমুখ করি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় সন্তান খৃষ্টান মিশনারীদের নামি দামি স্কুলে চান্স পেয়েছে এজন্য। সন্তান স্কলারশিপ পেয়ে ইসলামের জঘন্যতম শত্রু ইহুদীদের ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এজন্য।

তাই কলিজার টুকরা সন্তানের কচি সিনা বিধর্মীদের হাতে সোপর্দ না করে আসুন সাহাবায়ে কেরামের মতো আমরাও সন্তানকে আল্লাহ পাকের কালাম শেখাই। আসমান-জমিনের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র, নূরানী ও সবচেয়ে বরকতময় কালাম কুরআন মজীদ। তাহলে এ থেকে আমার সন্তানকে বঞ্চিত করব কেন? এই কচি মনে যদি আল্লাহর পবিত্র কালাম স্থান পেয়ে যায় তাহলে জীবনে সে প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলেও অন্তরের এই নূর তাকে সৎ পথে চলতে সাহায্য করবে। সে খড়কুটার মতো অন্যায়ের জোয়ারে ভেসে যাবে না ইনশাআল্লাহ।

৩.দ্বীন না শেখানো

সন্তানকে কুরআন শেখায় না এমন মা-বাবার হার যদি শতকরা ৭০ হয়ে থাকে তবে দ্বীন শেখায় না এদের হার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ। নামায কীভাবে পড়বে তাও শেখায় না। হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, অযু-গোসল তো দূরের কথা। অথচ সন্তানকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো পিতা-মাতার উপর ফরয। এটা না শেখানো সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম।

বাবা-মাকে এ ভুলের জন্য কিয়ামতের দিন চুলচেরা জবাব দিতে হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সতর্কবাণী : 'পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।' (সহীহ বুখারী ১/২২২, হাদীস ৮৯৩)

৪.সন্তানকে ইসলাম বিদ্বেষী করে গড়ে তোলা

আধুনিকতার লেহাজ করে অনেক মা-বাবাই তাদের সন্তানদেরকে ইসলামের আহকাম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিদ্বেষী করে গড়ে তোলেন। টুপি-দাড়ি, আলিম-ওলামা, মাদরাসা-মসজিদ ইত্যাদি বিষয়ে একটা নেতিবাচক ধারণা। তাদের অন্তরে ঠাঁই পায় (নাউযুবিল্লাহ)। শৈশব থেকেই নাস্তিক প্রকৃতির শিক্ষক বাছাই করা হয়। উপরন্তু স্যাটেলাইট চ্যানেল, ইন্টারনেট এর অবাধ ব্যবহার তো আছেই। সাথে সাথে এ ধরনের লেখকদের বইপত্র পড়তে দেওয়া হয় এবং এই মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের পরিবেশেই তাদের বিচরণকে বিচক্ষণতার সাথে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এভাবে শিশুর মন-মানসকে বিষাক্ত করে

দেওয়া হয়। এটা মারাত্মক ভুল। এজন্য পিতামাতাকে আল্লাহর দরবারে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

৫.শিশুর প্রথম পাঠশালা

শিশুর প্রথম পাঠশালা হচ্ছে মায়ের কোল। এখানে সে জীবনের অনেক কিছু শেখে। পরবর্তীতে এটাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। শরীয়তে এই পাঠশালার অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই যে, শিশুর এই প্রথম শিক্ষা শুরু হয় টিভি দিয়ে। মা-বাবা তাদেরকে সাথে নিয়েই টিভি দেখে, ধীরে ধীরে এই ছোট বাচ্চাটি নাচ-গান থেকে শুরু করে সব ধরনের অশ্লীলতা শিখতে থাকে, বড় পুতুল নিয়ে খেলা করে, ঘুমায়। ফুলের মতো এই বাচ্চার জীবন কী দিয়ে শুরু হচ্ছে একটুও কি তা ভেবে দেখা হয়েছে। এ সবই ভুল। আমানতের খেয়ানত।

শরীয়তের আদেশ হল, ভূমিষ্ট হওয়ামাত্র শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিবে। যেন তার জীবন শুরু হয় আল্লাহর বড়ত্বের বাণী ‘আল্লাহু আকবার’ দিয়ে এর পর মা-বাবার দায়িত্ব হল সন্তানের ভালো অর্থবোধক নাম রাখা। বাচ্চা কথা বলা শিখলে তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম শেখানোর চেষ্টা করা উচিত। যিনি এই সন্তান দান করলেন এরপর তাকে বাকশক্তি দিলেন তার নাম সর্ব প্রথম শেখানোই কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘সন্তানকে প্রথম কথা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শেখাও এবং মৃত্যুর সময় তাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকীন কর।’ (শুআবুল ঈমান ৬/৩৯৭-৩৯৮, হাদীস ৮৬৪৯)

বাচ্চা বয়সেই অল্প অল্প করে আল্লাহর পরিচয় শেখানো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শেখানো, গল্পে গল্পে তাঁর পরিচয় ও আখলাক তুলে ধরা পিতামাতার কর্তব্য। এককথায় তার জীবনের প্রথম পাঠশালা থেকে সে যেন দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করে তা আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। ছোট ছোট আদব-কায়দা, যেমন ডান হাতে তিন শ্বাসে বসে পানি পান করতে শেখাবে। জুতা পরিধান করতে আগে ডান পা এবং খোলার সময়

আগে বাম পা খোলা। বাথরুমে ঢোকার সময় আগে বাম পা, বের হওয়ার সময় ডান পা ইত্যাদি শেখার উত্তম সময় এই শৈশবটাই। ঘুমের দুআ, ঘুম থেকে ওঠার দুআ, খাওয়ার দুআ ইত্যাদি সহজ বিষয়গুলো এবং ছোট ছোট ব্যবহারিক সুন্নতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার সময় এখনই। আর এটার দায়িত্ব মা-বাবার।

৬.বিধর্মীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিধর্মী শিক্ষককে প্রাধান্য দেওয়া

স্বাভাবিকভাবে অমুসলিম দেশের শিক্ষা কারিকুলাম, ড্রেস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী।

এগুলোতে পড়ার দ্বারা ছাত্রের একদিকে যেমন ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠে অন্যদিকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ভবিষ্যৎটা ঐভাবেই গড়ে উঠে।
সন্তানের জন্য এমন স্কুল নির্বাচন করা বড় ধরনের ভুল।
একজন সাধারণ মুসলমানের এটুকু সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধ থাকা চাই যে, নিজের সন্তানকে কোনো বিধর্মীর হাতে তুলে দিবে। লক্ষ করে দেখুন তো কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান কি তার সন্তানকে কোনো মুসলিমের হাতে তুলে দেয়? তারা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে যে, ছাত্রের উপর তার শিক্ষকের অনেক ধরনের প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে পরিণত বয়সের আগে তো শিক্ষকের অনেক কিছুই ছাত্রের হৃদয়পটে অংকিত হয়ে যায়। তাই সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দ্বীনী মাদরাসা সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু কেউ যদি এতটুকু না পারেন তবে অন্তত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী এবং ধর্মীয় ভাবধারার ইসলামিক স্কুল নির্বাচন করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে অভিভাবকের ভুল পদক্ষেপ সন্তানের জন্য বড় ধরনের সর্বনাশ ডেকে আনে। এ পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। কিন্তু পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায়, অগ্নিপূজক বানায়। (সহীহ বুখারী ১/১৮৫, হাদীস ১৩৮৫; সহীহ মুসলিম ২/৩৩৬, হাদীস ২৬৫৮)

৭.উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশ

অনেক মা-বাবাই সন্তানকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অমুসলিম দেশে অবস্থান করেন। প্রশ্ন এই যে, এই সন্তান কি সেখান থেকে শুধু উচ্চ ডিগ্রীই অর্জন করবে? নাকি সঙ্গে ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতাও শিখবে, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন তার অভিভাবকগণ? মসজিদে ওই সন্তানের জন্য হুজুরের কাছে দুআ চাওয়া হয় কিন্তু কখনও কি হুজুরের কাছে এ সম্পর্কিত মাসআলা জেনেছেন যে, এই সব দেশে উচ্চ ডিগ্রী কিংবা উপার্জনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার/থাকার হুকুম কী? মাসআলা হল, বৈরী পরিবেশে থেকে যে ব্যক্তি ইসলামী আদর্শের উপর অবিচল থাকতে পারবে না তার জন্য সেখানে থাকার কোনো অনুমতি নেই। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। কেননা, এতে ইচ্ছা করেই নিজেকে গুনাহ ও কুফুরীর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

৮.সন্তানের স্বাধীনতার নামে তাকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া

ইউরোপ-আমেরিকাই সন্তানের ব্যাপক স্বাধীনতার প্রবক্তা। যখন সন্তানের আখলাক চরিত্র গড়ার সময় তখন তাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ভালো-মন্দ পরিবেশে মিশে যখন যার সাথে ইচ্ছা ঘুরাফেরা করে। ইন্টারনেটে সব ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে থাকে। ধীরে ধীরে সে নানা ধরনের মন্দ প্রবণতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই সন্তানই মা-বাবার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াঁয়। সময়মতো সঠিক তারবিয়ত না করার কারনে বড় হয়ে সন্তান বাবা-মার অবাধ্য হয়ে যায়। তাই এই ধরনের স্বাধীনতা দুনিয়াতেও সন্তান এবং পরিবার কারো জন্য সুখের কারণ হয় না। এর ফলে বিশৃংখলা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এক বৃহৎ অংশ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়ে যায়।

আমাদের কর্তব্য ও করনীয়

আমরা জানি অমুসলিম দেশে (ইউরোপ-আমেরিকা) রাত-দিন উদয়ন্ত পরিশ্রম করা হয় অর্থ উপার্জন এর জন্য - জীবিকার প্রয়োজন। জীবন এ হালাল অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমেও আমরা আমাদের যে ইমানি দায়িত্ব আছে তাহল ঘরে ইসলামী পরিবেশ কায়েম করা।

আমাদের কর্তব্য হল, সন্তানের দুনিয়াবি প্রয়োজনগুলো যথাসাধ্য পূরণ করা এবং সে যেন আখেরাতে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাত লাভের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করতে পারে— এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ...

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর...। —সূরা তাহরীম (৬৬) : ০৬

আমরা অনেকেই সন্তানের অস্থায়ী ভবিষ্যতের সফলতার জন্য তো নানান চেষ্টা ও তাদবীর করি; কিন্তু তার চিরস্থায়ী সফলতার ব্যাপারে উদাসীন থাকি।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে রক্ষা এবং জান্নাত লাভের মৌলিক দুটি উপায় উল্লেখ করেছেন—

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী; তারা তাতে চিরকাল থাকবে। —সূরা বাকারা (২) : ৮২

এমন আরও অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর বার্তা হল— ‘জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের উপায় ঈমান ও নেক আমল।’

অতএব সন্তানকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে হলে, তাকে ঈমান ও নেক আমলের ধারক এবং কুফুর, শিরক ও মন্দ কাজ বর্জনকারী বানাতে হবে। এজন্য ছোট থেকেই তার পেছনে পরিকল্পিত মেহনত করতে হবে।

এক. সন্তানের জন্য দুআ করা

সন্তানকে নেককার হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সাথে সাথে দুআও করতে হবে— আল্লাহ তাআলা যেন তাকে নেককার বানান। এমন দুআ কুরআনে কারীমে অনেক রয়েছে। যেমন—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে আমাদের দান করুন চোখের শীতলতা এবং আমাদের পরহেযগারদের জন্য আদর্শ বানান। —সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪

ইবরাহীম আ.-এর দুআ—

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে একজন সৎপুত্র দান করুন। —সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০০

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ.

অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকেও (একদলকে)। হে আমাদের রব! আর আমাদের দুআ কবুল করুন। —সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

দুই. নিজেদের পরিবেশ ও চালচলন ঠিক করা

শিশুরা পরিবারের সদস্যদের দেখে শেখে। এই শেখা শুরু হয় মুখ ফোটারও আগে। অনেক শিশু অন্যদের দেখাদেখি নামায পড়ে, হাত বাঁধে, রুকু-সিজদা করে। তাই শিশুর দ্বীনী তারবিয়াতের জন্য দ্বীনী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

তিন. শিক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া

নিকট অতীতের বিখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রাহ. বলেন—

'আম্বিয়ায়ে কেরামের দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি হল : এটি মূলত আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতির জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দাবি এই যে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাসআলা হল, আখেরাতে সফলতা অর্জন করা। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার সন্তানের এই হক সাব্যস্ত করেছেন যে, একেবারে প্রথম থেকেই তার দ্বীনী তালীম ও তারবিয়াতের ফিকির করবে। এতে অবহেলা করলে গুনাহগার হবে।' —মাআরিফুল হাদীস ৩/২৭৪

অতএব সন্তানকে প্রথমে আল্লাহর নাম ও কালিমা শেখাতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন যিকির, মাসূর দুআ এবং ইসলামী শিষ্টাচার শেখাতে হবে।

নবীজীর আমল দেখুন— ওমর ইবনে আবি সালামা রা. বলেন, আমি ছোট অবস্থায় নবীজীর কাছেই লালিত পালিত হয়েছি। একবার খাওয়ার সময় পাত্রের চতুর্পাশ থেকে খাচ্ছিলাম। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন—

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

‘হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার পাশ থেকে খাও।’ —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০২২

এভাবে শিশুকে ছোট থেকেই হাতে-কলমে সুন্নত, আদব ইত্যাদি শেখানো।

চার. সন্তানকে কমপক্ষে ফরযে আইন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শেখানো

সন্তান একটু বড় হলে তাকে ধীরে ধীরে ওযু, গোসল, নামায, কুরআন কারীমের তিলাওয়াত ও আকায়েদ থেকে শুরু করে দ্বীনের মৌলিক বিধানগুলো শেখাতে হবে।

পাঁচ. সন্তানকে নেক আমলে অভ্যস্ত করা

সন্তানকে নেক আমলে অভ্যস্ত করার জন্য আমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবে :

ক. নিজেরা নেক আমলে পাবন্দ হতে হবে। কেননা শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে।
খ. নামায, রোযা ও অন্যান্য আমলে সন্তানকেও নিজেদের সাথে শরীক করতে হবে।
গ.বাচ্চাকে নেক আমলের আদেশ দিতে হবে। এই ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করে বলেন—

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰي.

আর আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকুন। আমি আপনার নিকট রিযিক চাই না, আমিই আপনাকে রিযিক দান করি। আর শুভ পরিণাম তাকওয়া (অবলম্বনকারীদের) জন্য। —সূরা ত্ব-হা (২০) : ১৩২

ছয়. সন্তানকে স্বাধীন ছেড়ে না দেয়া

সন্তানকে একেবারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া যাবে না; বরং বুঝের বয়স হওয়া থেকেই তাকে পরিমিত শাসনের মধ্যে রাখার ব্যাপারে এ হাদীস সুস্পষ্ট দলীল। এছাড়া সাহাবা, তাবেঈন থেকে বহু বর্ণনা রয়েছে যে, মা-বাবার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল, সন্তানকে দ্বীন শেখানো, মন্দ কাজ ও মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা। শুধু কি তাই? সন্তানের পরিণত বয়সে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও তাদের দায়িত্ব। যেন তারা কোনো পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে যায়। অভিভাবকদের শীথিলতার কারণে সন্তান যদি কোনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তবে এর জন্য দায়ী হবেন অভিভাবকগণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যার সন্তান রয়েছে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম চরিত্র শেখায়। যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিয়ে দেয়। বালেগ হওয়ার পরও যদি বিয়ে না দেয় আর সে কোনো গুনাহ করে ফেলে তবে তার এ গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।' (শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৬/৪০১, হাদীস ৮৬৬৬)

সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীতার অজুহাতে সন্তানকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়ে উদারতা করা সন্তানের নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ :

ক) অসৎ সংশ্রব অবলম্বনে বাধা প্রদান না করা। সহপাঠী হোক কিংবা প্রতিবেশী খারাপ দুঃশ্চরিত্র ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া। যখন যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে মিশতে দেওয়া। এতে তাদের খারাপ চরিত্র অতি দ্রুত সন্তানের মধ্যে চলে আসে এবং সেও এক সময় তাদের মতো বা তাদের চেয়ে আরো খারাপ হয়ে যাবে।

খ) ইন্টারনেট এর অশ্লীল প্রোগ্রাম, সিনেমা, টেলিভিশন, অশ্লীল ছবি, নাচ-গান ইত্যাদি দেখতে বাধা না দেওয়া। এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। এতে সন্তান পড়ালেখার পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার স্বভাব-চরিত্রে অশ্লীলতা প্রবেশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে।

গ) পর্দার বিষয়ে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। ঘরে-বাইরে সর্বত্র শরয়ী পর্দা রক্ষা করা ফরয। কিন্তু তথাকথিত মডার্ন ফ্যামিলী শরীয়তের এ হুকুমের প্রতি শীথিলতা করে থাকে। নিজেরা যেমনি পর্দা করে না তেমনি সন্তানকেও পর্দায় থাকার আদেশ দেয় না। এর কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুনাহ ব্যাপক হচ্ছে। সন্তানের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। তাই এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘ) ছেলেদেরকে মাহরাম নয় এমন মেয়েদের সাথে মিশতে দেওয়া এবং মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে একাকী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও ধ্বংসাত্মক।

ঙ) যথাসম্ভব পরিবার নিয়ে মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে বসবাস করা। কারণ পরিবেশ দ্বারা সন্তান প্রভাবিত হয়। তাই ছোট থেকেই তাদের ইসলামিক মাইন্ডে বড় করা।

সাত. শিশুর অন্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আখেরাতমুখী চিন্তা-চেতনার বীজ বপন করা

এ উদ্দেশ্যে আমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবে :

ক. বাচ্চাকে এই বিষয়ে তার মতো করে নসীহত করতে হবে। এই বিষয়ে অনুসরণীয় হল, লুকমান আ.-কতৃর্ক স্বীয় পুত্রকে নসীহত। যা কুরআন কারীমের সূরা লুকমানের ১৩, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মোট পাঁচটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তেমনি ইবরাহীম আ. ও ইয়াকুব আ.-কতৃর্ক নিজ সন্তানদেরকে উপদেশ। যা সূরা বাকারার ১৩২ ও ১৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. নবীদের কাহিনী, আমাদের নবীজীর সীরাত ও সাহাবা-তাবেয়ীন এবং আকাবির-আসলাফের জীবনী ও ঘটনাবলি শোনানো।

গ. সন্তানদের মসজিদে নিয়ে যাওয়া। উলামায়ে কেরামের মজলিসে নিয়ে যাওয়া। কারণ ওলামায়ে কেরাম হলেন এই গুণের ধারক বাহক।

ঘ.অমুসলিমদের পরিবেশ পরিস্থিতি ও তাদের সংস্কৃতি যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তার ভয়াবহতা ও পরিণতি নিয়ে সন্তানদের সাথে আলোচনা করা। মুসলিমদের সংস্কৃতি গ্রহণ না করা।

ঙ. সামর্থ্য হলে পরিবার নিয়ে হজ ও ওমরাহ পালন করা।

চ. বিশেষ করে সন্তান এর যে প্রশ্ন আসবে মনে, অমুসলিমদের জীবন পদ্ধতি দেখে, তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা। তার জন্য পিতা-মাতাকে সঠিক তারবিয়াত শেখা। ইসলাম কে তাদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে তাদের ইসলাম কে বুঝতে সাহায্য করা। সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়তো সম্ভব নয় সবার পক্ষে। সঠিক উত্তর যে জানে তাদের কাছে জেনে সন্তান কে জানানো পিতা-মাতার কর্তব্য। যখন একটি শিশু দেখবে তার পিতা -মাতা তার প্রশ্ন গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে সে তখন জিনিস টি নিয়ে ভাববে। সে ইসলাম এর প্রতি আকৃষ্ট হবে।

ইসলামি সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ

ইসলামি সভ্যতার ও পাশচাত্য সভ্যতার ভিত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ঘোষণা হলো, মানবজাতি ও গোটা বিশ্বজগৎ সুপরিকল্পিতভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।

ইসলাম শুধু কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম নয়। আল্লাহ তাআলা নবি ও রাসুল পাঠিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে জীবন-যাপনের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেছেন। ঐসব জ্ঞানের সমষ্টিই হলো দীন ইসলাম বা ইসলামি জীবনবিধান। মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি কীভাবে ব্যবহার

করবে, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক জীবন কীভাবে পরিচালনা করলে দুনিয়ায় মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাবে, সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবি রাসুলগণকে যে জ্ঞান দান করে পাঠিয়েছেন সেসবের সামষ্টিক নাম-ই দীন ইসলাম।

আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কেন্দ্র হলো ইউরোপে। বলা হয়, রোমান ও গ্রিক সভ্যতা থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, প্রাচীন গ্রিক, রোমান এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর মাঝে যে পৌত্তলিক চেতনা বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ এখনো পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়; যদিও তাদের জীবনধারায় ধর্মীয় অনুশাসন নেই বললেই চলে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আল্লাহর হেদায়াতের কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। ধর্মের নামে চার্চের অন্যায় ও জুলুমের দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তারা তাদের গডকে চার্চে বন্দি করে রেখেছে এবং চার্চের বাইরে আসার উপর ১৪৪ ধারার মতো নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাই তারা গড থেকে কোন পথনির্দেশ নিতে রাজি নয়। তাদের কাছে গড-এর বাণী হিসেবে যে বাইবেল রয়েছে, তা তো মানব রচিত গ্রন্থ। ইনজিল কিতাব যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল বর্তমানে তার তো কোনো অস্তিত্ব নেই; তাহলে গড-এর পথনির্দেশ তারা কোথায় পাবে?

তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলেই বিশ্বস্রষ্টার কোনো অবস্থান নেই। তাদের জ্ঞানের উৎস সৃষ্টিকর্তা নয়, ইতিহাসলব্ধ মানবজাতির অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং মানুষের মেধা, প্রজ্ঞা ও সাধনালব্ধ জ্ঞানই তাদের একমাত্র সম্বল, তাই তারা সেক্যুলার হতে বাধ্য।

আজ পর্যন্ত কুরআনের কোনো জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। কারণ, বিজ্ঞান সৃষ্টিজগতের যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তা যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, কুরআনও ঐ একই উৎস থেকে এসেছে। কুরআনের মতো কোনো বিশুদ্ধ সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে জ্ঞান পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে নেই। বিশ্বে মুসলিম শাসনামলে কুরআনই বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা জুগিয়েছে। বর্তমানে মুসলিম জাতি কুরআনের জ্ঞান চর্চা না করায় পাশ্চাত্যের দুয়ারে জ্ঞানের ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম

পশ্চিমা সভ্যতার মূলভিত্তি হলো সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ বা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মচর্চার অনুমোদন দেওয়া। তারা মনে করে সেক্যুলারিজম থেকে উদ্ধৃত তাদের জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ গোটা বিশ্বের মেনে নেওয়ালারিজম এর জন্য অন্যদের বাধ্য করাও তাদের দায়িত্ব বলে তারা মনে করে। কারণ, তাদের বিশ্বাস পশ্চিমা সভ্যতাই একমাত্র সঠিক ও আদর্শিক।

অথচ Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো এমন এক সামগ্রিক বিশ্বাস, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে, শুধু ব্যক্তিগত ধর্মীয় ইবাদতের অনুমোদন করে। এ মতবাদ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের কোনো প্রভাব গ্রহণযোগ্য নয়; নাগরিক নীতিমালা প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো প্রভাব থাকতে পারে না। অথচ ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তিগত ইবাদতের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়, অনুরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও নির্দেশনা দেয়। কেননা ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা আছে। এসব নির্দেশনা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মানা ফরজ। তাই Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ।

ইসলামি সভ্যতা যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, ধর্মনিরপেক্ষতা তার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলামি সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে একজন মুসলিমের বিশ্বাস ও তার ইবাদত। একটি ইসলামি সমাজ মানেই হলো মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস এবং কর্মের প্রতিচ্ছবি। ইসলামি শরিয়াহ আইনের ব ভিত্তিতেই মুসলিম জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এবং নাগরিকনীতি পরিচালিত হবে। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা একটি চরম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ এবং কুফর হিসেবে বিবেচিত। এই মূলনীতিটি পরিষ্কারভাবে কুরআনে উল্লেখ আছে-

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।(সুরা মায়েদাহ, আয়াত: ৪৪)

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি ফসলমাত্র। জীবজন্তুর মতো তার জীবনেরও তেমন বিশেষ কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। ব্যাপারটা এককথায় এমন- দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফুর্তি করো, আগামীকাল বাঁচবে কিনা কে বলতে পারো।' এই

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেকের মনে হতে পারে, ধর্ম মানুষকে জীবন উপভোগ করতে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই, ধর্মের পুরো ব্যাপারটি পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। কেউ যদি নিজেদের 'রঙিন দুনিয়া' থেকে গুটিয়ে রাখতে চায় রাখুক, তবে বাকিরা যেভাবে খুশি সেভাবে জীবনযাপন করতে পারবে, ধর্মের সেখানে নাক গলানো চলবে না। এই চিন্তা হলো পশ্চিমা সভ্যতা ও আদর্শের ভিত্তি, যা সকল অনিষ্টতার জন্ম দিয়েছে।

পাশ্চাত্যে লাগামহীন যৌন স্বাধীনতা ও ইসলাম

পাশ্চাত্য সভ্যতার আরেকটি দিক হলো যৌনসম্পর্ক। তাদের সভ্যতা মতে বিবাহ ছাড়াই যৌনসম্পর্ক সম্পূর্ণ বৈধ বলে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। আধুনিক যুগের পশ্চিমা আইনপ্রণেতারা হিসাব-নিকাশ করে এই উপসংহারে এসে পৌঁছেছে যে, 'বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট নামের এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ধর্মীয় বিধি- নিষেধের কারণেই এখানে 'পারস্পরিক সম্মতি' সত্ত্বেও যৌনতাকে অবৈধ বলা হচ্ছে।'

সে সময়ের আইনপ্রণেতারা বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্কের বৈধতা নিরূপণে নতুন আইন প্রণয়ন করে। ধর্ষণ যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে একটি অগ্রহণযোগ্য ব্যাপার; তাই তারা আইনটি সাজাল এভাবে-উভয়পক্ষের 'সম্মতি' থাকলেই যেকোনো যৌনসম্পর্ক বৈধ এবং গ্রহণযোগ্য হবে। তবে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোনো শিশুর সাথে যৌনসম্পর্ক (Pedophilia) স্থাপন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা শিশুদের অপরিপক্কতার সুযোগ নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এ আইনের অপব্যবহার করতে পারে। এ কারণে তারা এ ধরনের যৌনসম্পর্কের বৈধতা প্রদান করতে 'সাবালকত্ব' (Adulthood) নামে একটি নতুন ধারা সংযোজন করল, যা প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি স্লোগানটি পুরো পশ্চিমজুড়ে সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। অবাধ যৌনতার বাঁধভাঙা জোয়ারে ভাসে তারা। নিজেদের মধ্যে স্ত্রী অদল-বদলের পার্টি (Wife Swapping) থেকে শুরু করে দল বেঁধে যৌনমিলন, টপলেস বার কালচার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অনাচার ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমাদের মাঝে।

পাশ্চাত্যের এই হীন চিন্তা থেকেই তারা বিয়েকে উপেক্ষা করে, বোঝা মনে করে। তারা মেয়েদের শুধু খেলনা মনে করে। মনে করে মেয়েরা কেবল পুরুষের যৌন চাহিদা মেটানোর বস্তুমাত্র।

এই প্রসঙ্গে শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দির বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। তিনি নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। একবার তিনি একটি কারখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানকার এক সিনিয়র ইনজিনিয়ার আরেকজনকে বলছে, তুমি এক মাসের জন্য এখানে এসেছ, যখন তুমি ফিরে যাবে তখন এ কথা জানা নেই, তুমি তোমার স্ত্রীকে পাবে কি না? এ কথার উত্তরে লোকটি বলল, আরে এটা চিন্তার কোনো বিষয় নয়। কারণ, Women are like buses if you miss one, take another one. (মেয়েরা হচ্ছে বাসের ন্যায়, যদি তুমি একটি বাস ফেল করো, তাহলে আরেকটিতে চড়ে বসবে)। যে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির এ অবস্থা সেখানে নারীর মর্যাদা কোন পর্যায়ে!

তিনি আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার UK এর এক ইনজিনিয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। কথোপকথনের একপর্যায়ে সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সন্তান-সন্ততি কয়জন? আমি আমার পারিবারিক অবস্থা তাকে বললাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সন্তানাদির খবর কী? সে বলল, আমি তো এখনো কুমার, বিয়ে করিনি। আমি বললাম, মনে তো হচ্ছে আপনার বিয়ের বয়স হয়েছে। সে বলল, হ্যাঁ, আমার বয়স এখন ৫২ বছর। আমি বললাম, আপনি শিক্ষিত মানুষ, বয়সও অনেক হয়েছে, কেন বিবাহ করছেন না? সে উত্তরে বলল-If you can find milk in the market, there is no need to have a cow in your house. (যখন তুমি বাজারে দুধ পাচ্ছ, তখন ঘরে গাভি পালার তো কোনো প্রয়োজন নেই)।

চিন্তা করুন, যে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির ভেতর এই ধ্যান-ধারণা, সে সমাজের অবস্থা কতটা নির্লজ্জ হতে পারে! ইসলাম এই নির্লজ্জতা ও বেলেল্লাপনার কঠোর বিরোধিতা করেছে। এর বিপরীতে লজ্জাশীলতার পবিত্র জীবন অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

পাশ্চাত্যে পরিবার বিপর্যস্ত হওয়ায় সবচেয়ে বেশি অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী। পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন, পর্নচিত্র ও নাচ- গানের মতো বিনোদন শিল্পে। পাশ্চাত্যে বর্তমানে পারিবারিক-ব্যবস্থার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা ঐতিহ্যবাহী ও প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। আগে পরিবার ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন একজন পুরুষ। যেমন: ইসলাম ধর্মে দায়িত্বের দিক থেকে পুরুষকে অধিকতর কর্তব্যপরায়ণ ভাবা হয়। তবে কর্তৃত্বপরায়ণ হিসেবে নয়। ধর্মীয় ও সাধারণ বিবেচনায়, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের পোশাকের মতো। এ ক্ষেত্রে একজনের উপর অন্যজনের কর্তৃত্ব নেই, আছে দায়িত্ববোধ। ইরানের সমাজ বিজ্ঞানী ড. শাহলা বাকেরি বলেছেন, পাশ্চাত্যে পরিবারব্যবস্থায় এই যে

পরিবর্তন, তা সমসাময়িক ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং এ পরিবর্তন সব শিল্পোন্নত দেশে প্রভাব ফেলেছে।

পাশ্চাত্যে যে রাষ্ট্র ও সমাজে 'বস্তুবাদ' যত বেশি প্রভাব ফেলতে পেরেছে, সেই সমাজ ও রাষ্ট্রে লিভ-টুগেদার ও সমকামিতা তত বেশি বেড়েছে। সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে। পরিবারগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে। শিশু কিশোররা নীতি ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বৃদ্ধ মা ও বাবার ঠাঁই হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা বাড়ছে। সমকামিতার মতো প্রকৃতিবিরোধী প্রবণতাও সমাজকে গ্রাস করছে। এরইমধ্যে পাশ্চাত্যের অনেক দেশে প্রকৃতি ও ধর্মবিরোধী এমন প্রবণতাকে আইনি স্বীকৃতিও দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে 'পরিবার' সম্পর্কে চিরাচরিত সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্য-সমাজে পরিবার সংকটের যে বর্তমান দৃশ্য আমরা দেখছি তার পেছনে অন্যতম কারণ হলো হিউম্যানিজম, লিবারেলিজম, সেক্যুলারিজম ও ফেমিনিজমের মতো বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব। গত কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকনীতির উৎস হিসেবে অনুসরণ করা হচ্ছে এসব মতবাদকে। পাশ্চাত্যের এসব মতবাদে ধর্ম ও নৈতিকতাকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব মতবাদ অনুযায়ী, অন্যের ক্ষতি না করে একজন ব্যক্তি সব ধরনের অনৈতিক কাজ করতে পারে। এ কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সমকামিতা, বিয়ে বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক এবং গর্ভপাতের মতো অনাচারগুলো স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হতে শুরু করেছে।

পাশ্চাত্যে লাগামহীন যৌন স্বাধীনতা ও পরিবার-ব্যবস্থায় ধ্বংসের মতো নৈতিক অবক্ষয়ের পেছনে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও ডারউইনের চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে। এই সব দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আর এরই
পরিণতিতে পাশ্চাত্যে যৌনাচার হয়ে পড়েছে অবাধ এবং পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্যে নৈতিক অধঃপতন দিনকে দিন শোচনীয় হচ্ছে। সেখানে কে কত বেশি নৈতিক ও পারিবারিক মূল্যবোধগুলোকে পদদলিত করবেন তারই প্রতিযোগিতা চলছে। চারিত্রিক অধঃপতন ও বিচ্যুতির এই ধারাকে তারা যৌন বিপ্লব বলে অভিহিত করছেন। ফলে পরিবার-ব্যবস্থা উপনীত হয়েছে পতনের দ্বার-প্রান্তে।

অথচ ইসলাম বৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ কারণে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মে। যৌন সক্ষমতা মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বড় নিয়ামত। আর নিয়ামতকে কাজে লাগানোর জন্য বিয়ে করার বিকল্প নেই। ভিন্ন কোনো পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করতে চাইলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও অনিরাপত্তা সৃষ্টি হবেই। ফলে ব্যক্তি ও সমাজকে পবিত্র ও সুস্থ রাখার জন্য বিয়ে তথা পরিবার গঠন অত্যন্ত জরুরি। তবে যৌন চাহিদা পূরণই বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মানবজাতি তথা গোটা বিশ্বকে টিকিয়ে রাখাও বিয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক থেকেও পরিবার গঠনের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। ইসলাম ধর্মে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। সুরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতে পুরুষকে পরিবারের আর্থিক ব্যয়বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সুরা নিসায় ব্যবহৃত 'নাফাকা' শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, আসবাবপত্র নিশ্চিত করার পাশাপাশি চিকিৎসা ব্যয়সহ অন্যান্য খরচ মেটাতে পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। নারীর ওপর পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। নারীর মূল দায়িত্ব হচ্ছে, সাংসারিক বিষয়াদি দেখাশোনা করা এবং সন্তান লালন-পালন করা। পাশাপাশি নারী সমাজের সব ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার অধিকার রাখে। তবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান বিলিয়ে দিয়ে নয়। নারী যাতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠামুক্ত থেকে পরিবারকে মায়া-মমতা ও ভালোবাসার নীড়ে পরিণত করতে পারেন, সে জন্যই তাকে অর্থনৈতিক দায়িত্বের বাইরে রাখা হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, নারী অর্থনৈতিক বিষয়ে একদম কথা বলতে পারবে না। বস্তুত মূল দায়িত্বটি দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার গঠনের ফলে নারী ও পুরুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি মনোযোগী হয়। অতীত অভিজ্ঞতাতেও দেখা গেছে, বিয়ের পর নারী ও পুরুষ-উভয়ই আরও বেশি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। অপচয় করা থেকে দূরে থাকে এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে আরও সচেতন হয়।

বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, একদিন অবিবাহিত এক যুবক রাসুলের কাছে এসে কিছু সাহায্য চাইল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুকি কি বিয়ে করেছ? যুবকটি বলল, না। তিনি ঐ যুবককে বিয়ে করতে বললেন। এরপর দেখা গেল, বিয়ের পরই তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটল।

সুরা নুরের ৩২ নম্বর আয়াতে বিয়ে করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

অশ্লীলতা ও ইসলাম

ইসলাম শালীনতা, নির্মলতা, পরিচ্ছন্নতা ও পূত-পবিত্রতার ধর্ম। এই ধর্মে অবাধ যৌনতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, জঘন্যতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার কোনো স্থান নেই। ইসলাম কুৎসিত, কুরুচিপূর্ণ, অশালীন ও জঘন্য সব অপকর্ম ও কুকর্মকে হারাম ঘোষণা করেছে।

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সর্বপ্রকার নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে নিষেধ করে দিয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়গুলো হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য' (সুরা আরাফ : ৩৩)। যদি কোনো ব্যক্তি আগুনের কাছে যায়, তা হলে তার আগুনের তাপে দগ্ধ হওয়ার ভয় থাকে। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি অশ্লীলতার উপায় উপকরণের কাছে যায়, তা হলে তার অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই মানুষ যেন অশ্লীলতা থেকে সহজে বাঁচতে পারে, তাই মহান আল্লাহ অশ্লীলতার উপায় উপকরণকেও বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য।' (সুরা আনআম : ১৫১)

ব্যভিচার : আগুনের সংস্পর্শে মোম যেমন গলে যায়, ঠিক তেমনি প্রাপ্তবয়স্ক নর যদি পরনারীর কাছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারী যদি পরপুরুষের কাছে যায়, তা হলে তারও গলে যাওয়ার তথা আকৃষ্ট হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। আর একে অন্যের প্রতি দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক। এ জন্য তারা যদি একে অন্যের কাছে অবাধে ও পর্দাহীনভাবে গমনাগমন করে, তা হলে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহ ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করার নিমিত্তে পরনারীর কাছে পরপুরুষ এবং পরপুরুষের কাছে পরনারী গমন করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ' (সুরা বনি ইসরাইল : ৩২)।

ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায় এমন ছোট ছোট পদক্ষেপগুলোও ব্যভিচার বলে গণ্য। ব্যভিচার করার পূর্বে ব্যভিচারকারী পুরুষ ও ব্যভিচারকারী নারী একজন আরেকজনের দিকে তাকায়। একজন অন্যজনের কথা শুনে। একজন আরেকজনের সঙ্গে প্রেমালাপ করে। একজন আরেকজনকে স্পর্শ করে। একজন অন্যজনের দিকে এগিয়ে যায়। এভাবে ব্যভিচারের পূর্বে ব্যভিচারের সহায়ক পদক্ষেপগুলোও ব্যভিচার বলে গণ্য। রাসুল (সা.) বলেন, 'আদম সন্তানের ওপর ব্যভিচারের যে অংশ লিখিত রয়েছে তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে। নিঃসন্দেহে দুই চোখের ব্যভিচার হলো তাকানো, দুই কানের ব্যভিচার হলো শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়ন করে বা পরিহার করে।' (মুসলিম : ৬৬৪৭)

ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা: আল্লাহ তাআলা পুরুষকে পুরুষ বানিয়েছেন এবং নারীকে নারী বানিয়েছেন। পুরুষকে পুরুষ হিসেবে শরীয়তের বিধান দিয়েছেন এবং নারীকে নারী হিসেবে শরীয়তের বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যাকে পুরুষ বানিয়েছেন সে পুরুষ হিসেবেই জীবনযাপন করবে আর যাকে নারী বানিয়েছেন সে নারী হিসেবেই জীবনযাপন করবে। এটি নারী ও পুরুষের প্রতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান। বর্তমানকালের একটি কুফরী মতবাদের দাবি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মতবাদটি 'ট্রান্সজেন্ডারবাদ' নামে ইতোমধ্যে পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের মূলকথা হল, কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী দাবি করে, তাহলে সে নারী, সবার তাকে নারী বলে মেনে নিতে হবে। তেমনিভাবে কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে, তাহলে সে পুরুষ, সবার তাকে পুরুষ বলে মেনে নিতে হবে। নাউযুবিল্লাহ। এটি একটি স্পষ্ট কুফরী মতবাদ। পশ্চিমা যৌনবিকারগ্রস্ত কিছু অমুসলিম গবেষক এ মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা যাকে পুরুষ বানিয়েছেন তাকে নারী বলা, যাকে নারী বানিয়েছেন তাকে পুরুষ বলা, এটি আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন। আল্লাহর হুকুমের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। আল্লাহর শ্বাশ্বত বাণীর চরম লংঘন। এটা শয়তানী চেষ্টা, শয়তানই মানুষকে দিয়ে এমন কাজ করিয়েছে। দেখুন, কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে বলেছে, আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন শয়তানের কাজ। এজন্য আল্লাহ তাআলা শয়তানকে অভিসম্পাত করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে-

لَّعَنَهُ اللهُ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا، وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ... اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا، يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا، اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا.

"...শয়তানকে আল্লাহ লানত করেছেন। সে (আল্লাহকে) বলেছিল, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্ধারিত এক অংশকে নিয়ে নেব। এবং আমি তাদেরকে সরল পথ থেকে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত করব, তাদেরকে (অনেক) আশা-ভরসা দেব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান চিরে ফেলবে এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুস্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়। সে ওদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশা-ভরসা দেয়। প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের সকলের ঠিকানা জাহান্নাম। তারা তা থেকে বাঁচার জন্য পালানোর কোনো পথ পাবে না।" -সূরা নিসা (০৪) : ১১৮-১২১

শয়তান মানুষকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেওয়ার হুকুম করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার হুকুম হল-

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দ্বীনের অভিমুখী রাখ। আল্লাহর সেই ফিতরত অনুযায়ী চল, যে ফিতরতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন সাধন নেই (অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন করো না)। এটাই সম্পূর্ণ সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" -সূরা রূম (৩০) : ৩০

কুরআন কারীমের এ আয়াতগুলো একটু খেয়াল করে পাঠ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ট্রান্সজেন্ডারবাদ পুরোপুরি শয়তানী মতবাদ। আল্লাহ তাআলার দেওয়া হেদায়েত এবং তাঁর নাযিলকৃত শরীয়তের সাথে এর ন্যূনতম সম্পর্ক নেই; বরং তা সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক।

এ মতবাদ অনুযায়ী কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী দাবি করে, তাহলে তার দাবি সবাইকে মেনে নিতে হবে। সে এখন অপর ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে। রাষ্ট্রের আইন এবং সমাজ তাকে বাধা দিতে পারবে না। অথচ ছেলে ছেলে বিয়ে স্পষ্ট সমকামিতা। একইভাবে কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে, তাহলে তার দাবি সবাইকে মেনে নিতে হবে। সে এখন অপর নারীকে বিয়ে করতে পারবে। রাষ্ট্রের আইন এবং সমাজ তাকে বাধা দিতে পারবে না। অথচ নারীতে নারীতে বিয়ে স্পষ্ট সমকামিতা। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে সমকামিতা যে জঘন্য হারাম কাজ, তা তো সবারই জানা। এ অপরাধের কারণেই হযরত লূত আলাইহিস সালামের কওমের উপর কঠিন আসমানী আযাব এসেছিল, যা কুরআন কারীমের বহু সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

সূরা আ'রাফে ইরশাদ হয়েছে-

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ، اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ، وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ، فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ، وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ.

"এবং লূতকে (পাঠালাম)। যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? তোমরা তো কামেচ্ছা পূরণের জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও! বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই কথা যে, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা বড় পবিত্র থাকতে চায়'। পরিণামে আমি তাকে (অর্থাৎ হযরত লূত আলাইহিস সালামকে) ও তার পরিবারবর্গকে (জনপদ থেকে বের করে) রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রী ছাড়া। সে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে শামিল থাকল (যারা আযাবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়)। আর আমি তাদের উপর (পাথরের) প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং দেখ, সে অপরাধীদের পরিণাম কেমন (ভয়াবহ) হয়েছিল।" -সূরা আ'রাফ (০৭) : ৮০-৮৪

ধর্মের দিক থেকে সমকামিতা মারাত্মক অপরাধ।

এ মতবাদে পশ্চিমা সমাজে যিনা-ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচারের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী দাবি করে আর দেশের আইন তা মেনে নেয়, তাহলে সে আবাসিক হোটেল বা বাসা-বাড়িতে কিংবা স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির ছাত্রী হোস্টেলে নারীদের

সাথে থাকার সুযোগ পাবে। মেয়েদের জন্য নির্ধারিত সকল স্থানে অনায়াসে যেতে পারবে। অনুরূপভাবে কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে আর দেশের আইন তাকে পুরুষ বলে মেনে নেয়, তাহলে সে আবাসিক হোটেলে, বাসা বাড়িতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে পুরুষদের সাথে থাকার সুযোগ পাবে। এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ তা বলাই বাহুল্য।

১৭ জুলাই ২০২২ ঈসায়ীতে নিউইয়র্ক পোস্টের এক খবরে বেরিয়েছিল, আমেরিকার নিউজার্সি রাজ্যের জেলখানায় ডেমি মাইনর নামের এক পুরুষ কয়েদী হঠাৎ করে নিজেকে নারী দাবি করতে শুরু করে। পরে জেলখানা কর্তৃপক্ষ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ অনুযায়ী তাকে মহিলা কারাগারে স্থানান্তরিত করে। কারাগারে নারীদের সাথেই রাখা হয় আপাদমস্তক পুরুষ ডেমিকে। ফলে তার সান্নিধ্যে গর্ভবতী হয়ে পড়ে দুই নারী কয়েদী। এ ঘটনার পর তাকে পুনরায় পুরুষের কারাগারে পাঠানো হয়।

এ মতবাদে পাশ্চাত্য সমাজে শুধু যিনা-ব্যভিচারই নয়, যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণও অতি সহজে ছড়িয়ে পড়ছে। কোনো নারী নিজের সমলিঙ্গের মনে করে নারীরূপী কোনো পুরুষের সাথে থাকলে তার কাছ থেকে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। অসৎ লোকেরা ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সহজে নারীদের কাছে পৌঁছার জন্য এই পথ বেছে নেবে। ফলে পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের জন্য নিরাপদ স্থান পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

ইসলামী শরীয়াতে যেখানে পুরুষকে নারীর পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছে, নারীকে পুরুষের বেশ-ভূষা গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তো এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। এ মতবাদ শুধু পোশাক আর বেশভূষা পরিবর্তন নয়, গোটা পরিচয়ই পাল্টে দিতে বলছে। আপাদমস্তক পুরুষকে বলা হচ্ছে নারী! আপাদমস্তক নারীকে বলা হচ্ছে পুরুষ! কত মারাত্মক বিকৃতি!!

হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীরূপ ধারণকারী পুরুষদের উপর এবং পুরুষরূপ ধারণকারী নারীদের উপর লানত করেছেন এবং বলেছেন, তাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুককে (তাঁর ঘরে আসলে) বের করে দিয়েছেন এবং অমুককে উমর রা. বের করে দিয়েছেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৮৬

অপর হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله.

আল্লাহ লানত করেন আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারী ঐ সকল নারীর প্রতি, যারা অন্যের শরীরে উল্কি অঙ্কন করে এবং নিজ শরীরে উল্কি অঙ্কন করায়। যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রু-চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব পুরুষকে লানত করেছেন, যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীকে লানত করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫

পতিতাবৃত্তি: অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সমাধা করা গর্হিত কাজ। যৌনকার্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। এর সমাধান না হলে মানুষ তার জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

কোন নারী স্বেচ্ছায় নিজেকে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত করতে পারবে না। এটা হারাম তথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্য কেউ তাকে দিয়ে দেহ ব্যবসায় পরিচালনা করতে চাইলে তাও হারাম। আল কুরআনে এসেছে,

وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

তোমরা যুবতীদের দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য করো না। (আল কুরআন ২৪:৩৩)

ইসলাম ব্যভিচার ও দেহ ব্যবসায়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পর্ণোগ্রাফি তৈরি অশ্লীলতা ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচায়ক। তরুণ-যুব-শিশুর চরিত্র হনন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম যে কোন প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছে।

পুংমৈথুন: পুংমৈথুন অত্যন্ত নোংরা, গর্হিত, কদর্য ও কুরুচিপূর্ণ কাজ। সুস্থ রুচিবোধসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি পুংমৈথুনে লিপ্ত হতে পারে না। ইসলাম পুংমৈথুনকে হারাম করেছে। রাসুল (সা.) পুংমৈথুনকারী ব্যক্তিকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করে বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে মলদ্বারে সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত’ (আবু দাউদ : ২১৬২)।
যদি কোনো ব্যক্তি রাজাধিরাজ আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি কামনা করে, তা হলে তাকে স্ত্রীর পেছনের রাস্তা দিয়ে রতিক্রিয়া সম্পাদন করা হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে, আল্লাহ তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকান না।’ (ইবনে মাজাহ : ১৯২৩)

আল ওয়ালা ওয়াল বারা

'আল-ওয়ালা' এটি আরবি শব্দ। যার মূল ধাতু হলো, ওয়াও, লাম, ইয়া। এটি অলিয়্যুন থেকে উদ্ভুত। অর্থ হলো বন্ধু, সাহায্যকারী, মিত্র, পৃষ্ঠপোষক। এর থেকেই ওয়ালা শব্দটি গঠিত। এর উদ্দেশ্য হলো বন্ধুত্ব, নৈকট্য, ভালোবাসা, সাহায্য-সহযোগিতা। আর যখন এ বাক্যটি আলিফ লাম সহ 'আল ওয়ালা' শব্দযোগে ব্যাবহৃত হয়, তখন তা একটি শরয়ি পরিভাষার রূপ নেয়। এর উদ্দেশ্য হলো, একজন মুমিন ব্যক্তির কার সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পোষণ করা উচিত, তার নির্দেশনা দেয়া।

'আকিদা আল-ওয়ালার' দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলাকে তারপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং পরে সকল মুমিনকে মহব্বত করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ওয়াজিব।

এমনিভাবে 'ওয়াল-বারা' শব্দটিও আরবি। যার মূল ধাতু হলো বা, রা, হামযাহ। বারা'র অর্থ হলো সে খারাপ হয়েছে, সে সন্তুষ্টরহিত কাজ করেছে, সে ঘৃণ্য কাজ করেছে, সে শত্রুতা করেছে, সে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বারা'র উদ্দেশ্য হলো, অসন্তুষ্টি ও ঘৃণা প্রকাশ করা কিংবা শত্রুভাবাপন্ন হওয়া অথবা কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

যখন এই বাক্যটি আলিফ-লাম সহ 'আল-বারা' শব্দযোগে ব্যবহৃত হয় তখন এটিও একটি শরয়ি পরিভাষায় রূপান্তর হয়। যার উদ্দেশ্য হলো, একজন মুমিন ব্যক্তি কার সাথে অসন্তুষ্টি, ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা উচিত, তার নির্দেশনা দেয়া।

আল-ওয়ালার ন্যায় আল বারাও অনেক ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। এর বাংলা অর্থ বুঝানোর জন্য আমরা 'শত্রুতা' শব্দটি নির্বাচন করেছি। যা বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ-হৃদ্যতার বিপরীত।

এখানে শত্রুতা দ্বারা আমাদের পরস্পর প্রচলিত অর্থের শত্রুতা নয়। অর্থাৎ একে অপরকে দেখার সাথে সাথেই আক্রমণ করে বসা কিংবা মারতে ও মরতে উদ্যত হওয়া। বরং এর দ্বারা ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির সেই অবস্থাকে বুঝায়, যা একজন মুমিন ব্যক্তির অন্তরে ইসলামের দুশমন কাফিরদের বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্যমান থাকা উচিত।

আকিদা আল-বারা'র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ইসলামের শত্রু কাফিরদের সাথে প্রচণ্ড ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা ওয়াজিব এবং সুযোগে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ তথা কিতাল করা, তাদের শক্তি ও ক্ষমতা চূর্ণ করা এবং তাদের থেকে জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া ফরজ।

ইসলামি শরিয়তে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র আকিদা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

কাফিরদের সাথে আল বারা এবং উত্তম আচরণ

আল ফারাকী রহ. তার 'ফুরুক' নামক গ্রন্থে উভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আল্লাহ তাআলা জিম্মি কাফিরদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখান করেছে। (সূরা মুমতাহিনা:১)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِم

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। (সূরা মুমতাহিনা:৮)

বাহ্যিকভাবে এ দুই আয়াত সাংঘর্ষিক মনে হলেও মূলত এ দুই আয়াতের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কারণ জিম্মিদের সাথে উত্তম আচরণ করা কাম্য এবং উদারতার বহিঃপ্রকাশ। যদিও তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, ভালোবাসা রাখা নিষিদ্ধ এবং আল্লাহর বিধিবর্জিত।

মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর জিম্মি কাফিররা আল্লাহ ও তার রাসূল এবং দীনে হকের পক্ষ থেকে জীবন-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা লাভ করে। ফলে মুসলমানদের জন্য তাদের নিরাপত্তা দান, তাদের অধিকার রক্ষা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ইবনে হাযম রহ, বলেন, এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, যদি হারবীরা কোনো জিম্মির ওপর আক্রমণ চালায়, তাহলে জিম্মিদের পক্ষে হারবীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব।

তাই একজন মুসলমান তো জিম্মির সাথে সদাচার করবে কিন্তু অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা রাখবে না এবং তার সাথে সদাচার করতে গিয়ে অন্তরের ভালোবাসা প্রকাশ পায়, কুফর ও কুফরের প্রতীকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়-এমন কোনো কাজ করবে না বরং এরূপ হলে একজন মুসলমান তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে।

মুসলমানদের মনে রাখতে হবে, স্বভাবগতভাবে তাদের অন্তরে রয়েছে আমাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তারা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আমাদের রবের অবাধ্য হয়েছে। সুযোগ পেলেই তারা আমাদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করবে, ক্ষমতাসীন হলে তারা আমাদের নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা করবে। সুতরাং তাদের সাথে আচরণবিধিতে রবের বিধান মান্য করাই নিরাপদ।

কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যতা:

আল্লাহ তাআলার বাণী-

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم

"কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি। (নাহল:১০৬)

আল্লাহ তাআলার বাণী-

ِالْكَافِرِينَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْم "এটা এজন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উওপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।(নাহল:১০৭)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যারা দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেয় তাদেরকে কাফির বলে অভিহিত করেছেন।

ইসলাম তার মৌলিক বিষয়াদিতে মুসলমানদের কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যতা গ্রহণ থেকে শুধুমাত্র নিষেধ করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি; বরং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যতা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে। কারণ সাদৃশ্যতা গ্রহণ থেকে বিরত থাকাটা মূলত 'আকিদা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া।

আরো একটি কারণ হলো, বাহ্যিক সাদৃশ্যতা একপর্যায়ে অন্তরের সাদৃশ্যতার পথ সুগম করে এবং কাফিরদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের মনোবৃত্তির অনুসরণের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ফলে মুসলিম সমাজে তাদের জীবনাচার ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং মুসলিম সমাজ চারিত্রিক অবক্ষয়ের এতটাই নিম্নস্তরে পৌঁছে যায় যে, তাদের বেশভূষা ও ফ্যাশন গ্রহণকেই সম্মান ও মর্যাদা ভাবতে শুরু করে। অথচ সমস্ত মর্যাদা ও সম্মান কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, পাশ্চাত্যের জীবনাচার আজ মুসলিম বিশ্বকে চারিদিক থেকে গ্রাস করে নিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ পদে পদে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করাকেই উন্নতি ও অগ্রগতি মনে করছে।

এ বিষয়ে উস্তাদ মুহাম্মাদ আসাদ রহ. বলেন- অগভীর জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই শুধু এমন বিশ্বাস পোষণ করতে পারে যে, কেউ কোনো সভ্যতার বাহ্যিক রীতিনীতি মেনে চলবে, কিন্তু সে সভ্যতার মূল চেতনায় সে প্রভাবিত হবে না।

শায়েখ আবদুল্লাহ তরীকী রহ. বলেন- যদি ইসলাম শত্রুর কাছ থেকে সব কিছু গ্রহণের এবং সব ক্ষেত্রে শত্রুর সাথে সাদৃশ্যতা গ্রহণের অনুমতি দিত, তাহলে ইসলামের নিদর্শন এবং তার বিধিবিধান বিলুপ্ত হয়ে যেত। মুসলমানদের পাথরসম ব্যক্তিত্ব বিগলিত হয়ে যেত। আজকের পৃথিবীতে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর দিকে তাকালেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কারণেই সিরাতে মুস্তাকিম তথা সরল পথের ওপর অটল-অবিচল থাকার নির্দেশ এসেছে এবং এতদ্ভিন্ন একাধিক পথে চলতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ
ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون

"এ পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সাবধান হও।(সূরা আনআম ১৫৩)

আহলে কিতাব ও মুশরিকদের বিরোধিতা করার জন্য শরিয়তে অনেক নির্দেশাবলী এসেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "যে কেউ কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। (সুনানে আবু দাউদ ৪০৩১; আহমাদ ৫১১৪)

ইমাম আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

এ হাদিসটি সার্বিকভাবে তাদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে।

অন্য আরো অনেক হাদিসে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্যতা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ এসেছে।

অমুসলিম দেশে বসবাস

আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৩ নং আয়াতে বলেন,

وان الله بريء من المشركين ورسوله এ আয়াতের মাধ্যমে মুসলমান ও কাফেরদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আর তার জন্য চার মাসের সময় দিয়েছেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দায়িত্বমুক্ত হলে সকল মু'মিন মুসলমানও দায়িত্ব মুক্ত হবেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَا بَرِئ مِمَّنْ سَكَنَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ مَاتَ بَيْنَهُم 'আমি এমন ব্যক্তি থেকে দায়িত্বমুক্ত, যে মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে রয়েছে এবং তাদের মাঝেই মৃত্যুবরণ করেছে।'

আপনি এটিও দেখতে পারেন,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُه সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কেউ কোনো মুশরিকের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সাথে বসবাস করলে সে তাদেরই মতো। (আবু দাউদ, হাদীস নং ২৭৮৭)

অমুসলিম দেশে যারা বড় হয়

এর কারণ মুশরিকদের সাথে থাকতে থাকতে কমপক্ষে অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের আগ্রহ দূর হয়ে যাবে এবং এতেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

নিজের অজান্তেই তার আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। মুশরিক-অমুসলমানদের সাথে থাকার ফলে সে যুবতী-মহিলাদের সাথে অবাধে মেলামেশা করবে।

এতে তার চরিত্র কলুষিত হবে। তখন আর পাপ দেখে তার চোখ রক্তিম আকার ধারণ করবে না। সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ হবে তোমাদের ঐ ছেলে-মেয়েদের অবস্থা, যারা আমেরিকা, ইটালি বা সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই বসবাস করছে।

একবারও কি চিন্তা করে দেখেছ, সেই মুসলমান মেয়ের কথা, সহ শিক্ষা ছাড়া যার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই?

সেখানে কোন মাদরাসা নেই, কোন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। এমন পরিস্থিতিতে তোমার মেয়ে আমেরিকার যুবকদের সাথে লেখাপড়া করবে, আমেরিকান কাফেরকে ভালবাসবে, তারপর তাকে বিয়ে করবে।

অথচ তুমি তার কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। কারণ, তাহলে আমেরিকার আইন তোমাকে জিন্দানখানায় নিক্ষেপ করবে।

তুমি কি তোমার মেয়ের ওপর হাত তুলতে পারবে, যখন সে কোন আমেরিকান ছেলের হাত ধরে কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যাবে?

তোমার মেয়ে যদি কোন ইটালিয়ান ছেলেকে বয়ফ্রেন্ড হিসেবে বেছে নেয়, তুমি কি তাকে বাধা দিতে পারবে? তুমি দেখবে, তোমার নাকের ডগা দিয়ে তারা সমুদ্রের তীরে বেড়াতে যাচ্ছে।

কিংবা রৌদ্রস্নান করতে যাচ্ছে। এ ধরনের অনৈতিক ঘটনা ঘটতে থাকবে, অথচ তুমি এর প্রতিবাদ করতে পারবে না। এই হল কাফেরদের সাথে বসবাস করার কুফল।

আমেরিকার এক মসজিদের ঘটনা

একবার আমেরিকার এক মুসলিম যুবক আমার নিকট এসে বলল, শায়খ ইউসুফ কারযাভী প্রথম যখন আমেরিকায় আসেন, তখন শিকাগোতে কোন মসজিদ ছিল না।

তার আগমনে স্থানীয় মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণে উৎসাহিত হয়। তারা মসজিদ নির্মাণের জন্য ষাট হাজার ডলার জমা করল।

ইঞ্জিনিয়ার যখন মসজিদের প্ল্যান তৈরি করতে এল, তখন ধনী মুসলমানরা, বিশেষত : যারা মসজিদ নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে,

তারা বলল, মসজিদের নীচে অবশ্যই নাচের জন্য হল রুম রাখতে হবে। আমেরিকায় নবাগত যুবক মুসলমানরা তাদের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

বলল, অসম্ভব। মসজিদে আবার কিভাবে নাচের হল রুম হতে পারে? তারা বলল, মসজিদের নীচে অবশ্যই নাচের হল রুম হতে হবে।

এতে আমাদের মেয়েরা আরব ছেলেদের সাথে নাচবে। তারা একে অপরকে ভালবাসবে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। আমেরিকান ছেলেদের বিয়ে করা থেকে তারা বেঁচে যাবে।

নবাগত যুবক মুসলমানরা তাদের বুঝাল, এটা তো ইসলামে বৈধ নয়। এ হল নবাগতদের অবস্থা। আর স্থায়ী বসবাসকারী সম্পদশালী মুসলমানদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয়, তা লিখে বুঝানো যাবে না।

তাদের ঈমান নিভু নিভু। আমেরিকার বিষাক্ত পরিবেশে তাদের ঈমান-আক্বীদা, আদব-আখলাক সব শেষ হয়ে গেছে।

এ পরিবেশে লোহার মত শক্ত ঈমানও গলে যায়। এ পরিবেশে ঈমান আমল সহীহ রাখার কোন উপায় নেই । যুবক মুসলমানরা যখন বলল, এটা বৈধ নয়।

তখন বর্ষিয়ানরা বলল, আমরা আমাদের দেয়া অর্থের বিনিময়ে উপকৃত হতে চাই। যুবকরা তাদের কথায় অটল, আর বর্ষীয়ান রাও তাদের সিদ্ধান্তে অনড়।

অবশেষে বর্ষিয়ানরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের দেয়া অর্থ ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ইতোমধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহে এক কুয়েতি এসে মসজিদ নির্মাণের জন্য তিন লাখ ডলার দিলেন।

গায়েবী সাহায্য

শিকাগো শহরে তখন কিছু ফিলিস্তিনী মহিলা বাস করত। তাদের মাঝে তখনও ইসলাম ও ঈমানের আলো বিদ্যমান ছিল।

তারা মসজিদ বানানোর জন্য জায়গা দান করল। সেই ফিলিস্তিনী মহিলাদের জায়গার ওপর মসজিদ নির্মিত হল। ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

যুবক মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল। আমি শিকাগোর সেই মসজিদে কয়েকবার গিয়েছি। তারা সেই মসজিদের নাম রেখেছে – Mosque Foundation (মসজিদ ফাউন্ডেশন)।

মুসলিম যুবকরা তার পরিচালনার দায়িত্ব নিল। একের পর এক নির্বাচনে কয়েকজন যুবক তার দায়িত্ব পালন করল।

অবশেষে এক ডাক্তার যুবক নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তার পরিচালনার দায়িত্ব নিল। তার সময়ে মসজিদে মহিলাদের নামায পড়ার ব্যবস্থা রইল না।

তখন মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, এই মসজিদ আমাদের। আমরা অবশ্যই মসজিদে আসব। পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে বলা হল, আপনাদের দাবি কী? আপনারা কি চান?

তারা বলল, আমরা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য হতে চাই। আমরা মসজিদের মিটিংয়ে শরিক হব।

আমরা আমাদের মতামত তুলে ধরব। ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশেষে অবস্থা কঠিন আকার ধারণ করল। শেষে মহিলারা কোর্টে গিয়ে মামলা করল।

তারা দাবি করল, এই মসজিদ আমাদের। পুরুষরা আমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সেই মসজিদের জনৈক দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমাকে বলেছে,

আমেরিকান বিচারপতি খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি কল্যাণময় কাজকে খুব ভালবাসতেন। ভাল কিছু দেখলে দারুণ আনন্দিত ও বিমোহিত হতেন।

তিনি বিষয়টি এবং লোক পাঠিয়ে আমাদের সংবাদ দিলেন যে, রাষ্ট্রীয় আইন কিন্তু মহিলাদের পক্ষে, যদিও আমার অন্তর আপনাদের পক্ষে।

আমি রাষ্ট্রীয় আইনের বিপরীতে রায় দিতে পারব না। সুতরাং মহিলাদের সাথে আপনারা আপোস করে ফেলুন। আলোচনার মাধ্যমে মিটমাট করে ফেলুন।

অন্যথায় মসজিদ মহিলাদের হাতে চলে যাবে এ হল আমেরিকার অবস্থা। Mosque Foundation (মসজিদ ফাউন্ডেশন)-এর সেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমার নিকট এক পত্রে লিখেছেন, আমার জন্য দু'আ করবেন।

আল্লাহ যেন আমাকে আমেরিকা থেকে মুক্তি দান করেন।

এক তাবলীগ জামাতের ঘটনা

ইসলাম নিয়ে কোন মুসলমান আমেরিকায় থাকতে পারে না। ঐ তো শাইখ আবু উমর। তাকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি সাক্ষী আছেন, কোন 'মুসলমান ইসলাম নিয়ে আমেরিকায় থাকতে পারেন কি না।

নিউইয়র্কের পার্শ্বে অবস্থিত নিউ জার্সি শহরেরও ঐ একই অবস্থা। শাইখ আবু উমরের সাথে সেখানে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

সেখানে কয়েকটি মুসলিম পরিবার বসবাস করে। আমি তাদের পেয়ে দারুণ আনন্দিত হয়েছিলাম। তারা একটি গির্জা কিনে তা মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল।

কিন্তু তারপরও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইসলামী জীবন-যাপন যে কত কঠিন, তা চিন্তা করাও অসম্ভব।

সেখানে সমাজ জীবনের সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

মানবতাবোধ ও চরিত্র বলতে কিছুই সেখানে অবশিষ্ট নেই। সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলব। পাদ্রীদের অবস্থা বেশি খারাপ।

পাদ্রীদের দায়িত্ব সমাজ সংস্কার করা আর তারাই যতসব কুকর্মে লিপ্ত ।

আমেরিকা থেকে আগত এক মুসলিম যুবক আমাকে বলেছে, একদা এয়ারপোর্টে একদল পাদ্রী দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাবলীগ জামাতের একদল মুসলমানও তাদের অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল।

তারা দেখল, সাদা পোশাকপরা একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত তাদের সাদা ধবধবে জুব্বা ঝুলে আছে।

তাবলীগ জামাতের আরব মুসলমানরা এগিয়ে গিয়ে পাদ্রীদের সাথে সাক্ষাত করল। পাদ্রীরাও এগিয়ে এসে আরব মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করল।

পাদ্রীদের সাথে একজন মহিলা পাদ্রী এগিয়ে এল এবং হাত বাড়িয়ে তাবলীগ জামাতের মুসলমানদের সাথে করমর্দন করতে চাইল।

কিন্তু মুসলমানরা হাত গুটিয়ে নিল। মহিলা পাদ্রী এতে দারুণ বিস্মিত হল।

সে তাদের ঠিকানা নিল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথায় উঠবেন?

তাবলীগের লোকেরা বলল, আমরা অমুক মসজিদে উঠব। তাবলীগ জামাতের লোকেরা তো মসজিদ ছাড়া কোথাও থাকে না।

ঠিক তারপরের দিনই সেই মহিলা পাদ্রী মসজিদে গিয়ে উপস্থিত। বলল, আমি জানতে এসেছি, আপনারা কেন আমার সাথে করমর্দন করলেন না।

তাবলীগের লোকেরা বলল, পুরুষের জন্য পরনারীর হাত ধরা ইসলামে হারাম। এ কথা শোনার পরই মহিলার ভাবান্তর সৃষ্টি হল। সে মুসলমান হয়ে গেল।

কাফেরদের ধোঁকা

বলল, আমি ঐ ধর্মমত পরিত্যাগ করলাম। কারণ, পাদ্রীরা করমর্দনের সময় আমার হাত পিষ্ট করে, সুড়সুড়ি দেয়। আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে পালাতে চাই।

গির্জার কথা আর কী বলব। প্রত্যেকটি গির্জা এখন বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

তাই বলছি, পাশ্চাত্য এক অন্ধকার জগত। এক জাগর অগ্নিকুণ্ড। পুরুষে পুরুষে আর নারীতে নারীতে সমকামিতার ছড়াছড়ি।

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুবের লেখা 'আমার দেখা আমেরিকা' বইটি প্রকাশ হতে পারেনি।

বলা হয় প্রেস থেকে বইটি আমেরিকান এম্বেসীর লোকেরা চুরি করে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে।

কিন্তু 'রিসালা' নামক পত্রিকায় সেই বইয়ের কয়েকটি অংশ প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি লিখেছেন, পাশ্চাত্যের যুবকরা তাদের প্রেমিকার সাথে, তাদের প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাত করতে গির্জায় গিয়ে মিলিত হয়।

গির্জা হল প্রেমের অভয়ারণ্য। যে সমাজকে ঘুণে ধরেছে, ধ্বংসের উপক্রম হয়ে পড়েছে, সে সমাজের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে।

তাই আমি বলছিলাম, মুশরিক থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, তাদের সঙ্গে বসবাস না করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ও জ্ঞানের বিচারে যুক্তিযুক্ত।

জনৈক মুসলিম ছাত্রের ঘটনা

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, انا بريء ممن سكن مع المشركين – আমি ঐসব লোকদের যিম্মামুক্ত, যারা মুশরিকদের সাথে বসবাস করে।'

আরো বলেছেন, ومن سكن المشرك ومات معه فهو منه যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে বসবাস করে এবং তাদের মাঝেই মৃত্যুবরণ করল, সে তাদেরই একজন।'

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে চার-পাঁচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তাই বলছি, পাশ্চাত্যে জীবন-যাপন করা মানে মুশরিকদের মাঝে জীবন-যাপন করা।

বরং তার চেয়েও শতগুণ ক্ষতিকর। তার চেয়ে অনেক কঠিন, কষ্টকর। পাশ্চাত্যের কথা আর কত বলব। বলে শেষ করা যায় না।

জর্দানে জন্ম নেয়া আমার এক ছাত্র এক শীর্ষ সম্মেলনে আমার নিকট এসে বলল, হুজুর, আর আত্মরক্ষা করতে পারছি না।

আর বেঁচে থাকতে পারছি না। বিয়ে না করলে বাধ্য হয়েই যিনা করতে হবে।

তিন মাস ধৈর্যধারণ করেছি। এখন আর পারছি না।

এভাবে বার বার বিভিন্নভাবে তার অসহায়ত্বের কথা আমার নিকট বর্ণনা করছিল।

আমি হলফ করে বলতে পারব, কেউ যদি এর বিপরীত কিছু বলে, তবে অবশ্যই সে মিথ্যা বলবে।

সেসব দেশে অবিবাহিত নারী-পুরুষ তথাকথিত স্বাধীনতার তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীরা অদ্ভুত একখণ্ড কাপড় পরছে। যা পরলে হাঁটুর উপরেও দশ সেন্টিমিটার উন্মুক্ত থাকে।

অথচ এরা নারী। এরা যুবতী। এরা রূপসী। একদা আমি ইসত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাথরুমে গেলাম। অজু করব। দেখলাম, কোন বাথরুমে দরজা নেই।

পুরুষদের বাথরুম, মেয়েদের বাথরুম সবগুলোরই একই অবস্থা। এটা কিভাবে হতে পারে? এটা কিভাবে সম্ভব?

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন,
ولقد هم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه
-'মহিলা তার ব্যাপারে চিন্তা করেছিল আর সেও মহিলার ব্যাপারে চিন্তা করত। যদি না সে তার প্রতিপালকের মহিমা অবলোকন করতো।' (সূরা ইউসুফ : ২৪)

পূতপবিত্র হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এমন কথা বলছেন, যার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সবাই আল্লাহর নবী ছিলেন।

তাহলে পাশ্চাত্যের লোকদের পতন সম্পর্কে ভাবা যায় কি!

এক ডাক্তারী পড়ুয়া ছাত্রের জিজ্ঞাসা

একদা ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী-ছাত্র আমার নিকট এল। সে অবিবাহিত। আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি বৃটেনে এক ইংরেজ পরিবারের সাথে থাকি।

সেখানে ডাক্তারি শিখি। আমার জন্য এটা জায়েয হবে?

বললাম, কিভাবে থাক? সে বলল, একই ফ্লাটের একই কামরায় থাকি।

আমি বললাম, কিভাবে রান্না কর? বলল, যৌথ। আমি বললাম, গোসলখানা? সে বলল, যৌথ। আমি বললাম, পায়খানা?

তখনো সে বলল যৌথ। আমি বললাম, তার স্বামী কি বাইরে থাকে? সে তখন বলল, কখনো রাতেও বাইরে থাকে। আর আমি ও তার স্ত্রী একই রুমে থাকি।

আমি বললাম, এটা জায়েয হবে না। এটা জায়েয হবে না। এটা জায়েয হবে না। সে বলল, তাহলে কী করব? আমরা চাই, মুসলিম ডাক্তার, মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হোক।

আমি বললাম, ওদের সাথে চললে সাত বৎসর পর তোমার ইসলামের কি কিছু বাকি থাকবে? সে বলল, তাহলে কি আমি লেখা-পড়া ছেড়ে দিব?

আমি কী করব? আমি তাকে বললাম, শিম, তরমুজ, টমেটো ইত্যাদি বিক্রি করে জীবন-যাপন কর। তবুও এভাবে থেক না।

একটু ভেবে দেখুন, একজন যুবক একই কামরায় অন্যের স্ত্রীর সাথে রাত কাটায়।

একই পাকঘর, একই গোসলখানা, একই বাথরুম ব্যবহার করে, আর রাতের পর রাত তার স্বামী বাইরে কাটায়।

জনৈক অফিসারের সাক্ষাৎকার

মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি বিভাগের এক অফিসার আমেরিকায় থাকতেন।

তিনি আমাকে বলেছেন, এক রাতে পুলিশ আমার নিকট তিনজন যুবককে ধরে নিয়ে এল।

তারা এইডস রোগে আক্রান্ত এক নারীর সাথে যিনা করেছে।

ফলে তারাও এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এ হল পাশ্চাত্যের সমাজ চিত্র।

তাই আমি বলি, স্ত্রী ছাড়া পাশ্চাত্যে থেকে লেখা-পড়া করা হারাম।

আমার এই ফতোয়া তোমরা সবার নিকট পৌঁছিয়ে দাও। আবার বলছি, হারাম, হারাম, হারাম।

একজন সুস্থ যুবক কিভাবে শুচিশুদ্ধ, পাক পবিত্র থাকবে, যখন তার প্রতিবেশী পরিবারের সুন্দরী রূপবতী কন্যা তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তার পিতামাতার সামনে তার হাত ধরে বাইরে চলে যাবে?

কোথায় ভাই সালাহ? তিনি সুইডেনে ছিলেন। আমার নিকট এলে আমি বললাম, আপনি কি সেখানে ছিলেন? আমার কণ্ঠের বিস্ময় ভাব অনুভব করে বললেন,

মধ্যরাতে মেয়েরা এসে দরজায় নক করে। কোথায় পালাব? দরজা তো বন্ধ, তাহলে ঐ সব মেয়েদের অবস্থা কেমন, যারা রাস্তাঘাটে রাত কাটায়?

যারা ইতালি বা সুইডেন থেকে এসেছে, তারা জানে, পাশ্চাত্যের সামাজিক পতন কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আমার বুঝে আসে না।

তারপর কিভাবে মুসলিম যুবকরা জিহাদ ছেড়ে, আফগানের রণাঙ্গন থেকে সুইডেন যায়। কেন যায়? ভ্রমণের জন্য? আল্লাহ তোমার ভ্রমণে কল্যাণ দান করুন।

কোথায় পালাচ্ছ তুমি?

তুমি কি জিহাদের দেশ ছেড়ে পৃথিবীর সবচে' নষ্ট-ভ্রষ্ট দেশে যেতে চাও? তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত, তাঁর রাসূলও।

আর যদি তোমরা তওবা কর অর্থাৎ ইসলামে ফিরে আস, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ।

যদি মুখ ফিরিয়ে নাও অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কুফরিতেই বহাল থাক এবং ঘোষণা মেনে না নাও, তাহলে তোমরা জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না।

তাহলে কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। দুনিয়াতে যুদ্ধে পরাজয় ও লাঞ্ছনার মাধ্যমে আর আখেরাতে জাহান্নামের মর্মান্তিক শাস্তির মাধ্যমে।

তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর তারা তোমাদের ব্যাপারে ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর।"

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই, একটু ভাবুন। আমরা কি করছি? আমাদের কি করা উচিত? কখনো ভ্রমণ করতে চাইলে কোন দেশে আমাদের ভ্রমণ করা উচিৎ?

আপনাকে হাতজোড় করে বলছি, নষ্ট সংস্কৃতি আপনাকে সাময়িক আনন্দ দিবে বটে। কিন্তু আজিবনের জন্য তা আফসোসের কারণ হবে। **নিজে বাঁচুন এবং অপরকে বাঁচান।**

তথ্যসুত্র: লেখাটি নেয়া হয়েছে ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর তাফসীরে সূরা তওবা এর ৩য় অধ্যায় থেকে। আল্লাহ ﷻ লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমিন।

সেক্যুলারিজম এর ধর্মীয় স্বাধীনতা

সেক্যুলারিজম

সেক্যুলার বা সেক্যুলারিজমের খাঁটি বাংলা অর্থ কি, তা অনেক সরলমনা মুসলমানরা না জেনেই সেক্যুলারিজমকে ভালো মনে করে থাকেন।

খাঁটি বাংলায় বলতে গেলে সেক্যুলারিজম মানে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত না করা।

ধর্মকে শুধুমাত্র কিছু রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থানে সীমাবদ্ধ রেখে দৈনন্দিন জীবন থেকে ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া নীতিকেই সেক্যুলারিজম বলা হয়।

রাষ্ট্রের এই চাপিয়ে দেওয়া নীতি বা সংবিধানকে বলা হয় সার্বভৌমত্ব সংবিধান। এটির ভুল ধরা যাবে না।

সংবিধানের কোনো নীতি পরিবর্তন করতে হলে সংসদে রীতিমতো তর্কযুদ্ধ করে তা পরিবর্তন করা যাবে। কিন্তু এর মধ্যে আবার মূলনীতি কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না।

এমনটাই হলো, সেক্যুলারিজম বা সেক্যুলারের অর্থ। এবার একটু আলোকপাত করি, এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমাদেরকে কতটা ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়?

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলে, সেক্যুলারিজম সকল ধর্মকে সমান চোখে দেখে। তারা ধর্ম যার যার উৎসব সবার বলে স্লোগান তোলে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো শুধুমাত্র ধোঁকা ও চোখের ভ্রম।

আমেরিকায় শয়তান পূজারিদের অধিকার

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যেহেতু বলে, "সকল ধর্ম সমান। সকলের নিজ নিজ স্থানে ধর্ম পালনের অধিকার আছে" –

এই স্লোগানের রেশ ধরেই একটা ভেজাল লেগেছিল আমেরিকাতে।

শয়তানের পূজারিদের ব্যাফোমেট নামক একটি মূর্তি আছে। যেটির আকৃতি হলো, মূতিটির মাথা ছাগলের কিন্তু শরীর মানুষের। মাথায় আছে বাঁকানো দুটি শিং। মাঝে আছে একটি

জলন্ত মশাল। কাঁধে আবার এক জোড়া পাখা। এক হাত আকাশের দিকে অন্য হাত মাটির দিকে তাক করা। আরো অনেক কিছু.....

২০১২ সালে আমেরিকার ওকলাহোমা রাজ্যের ক্যাপিট্যাল বিল্ডিংয়ের সামনে স্থাপন করা হয় বাইবেলের দশ আজ্ঞা-সংবলিত ‘টেন কমান্ডমেন্স মনুমেন্ট’ নামের একটি ভাস্কর্য।

সেখান থেকেই শুরু হয় আমেরিকায় একটি বিতর্ক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যদি আদৌ মান্য করা হয় তাহলে তো সকল ধর্মকেই এখন অনুমতি দিতে হবে, তাদের পবিত্র কিছু স্থাপনের জন্য।

এছাড়াও দেশের সরকারি ভবনের সামনে এমন ধর্মীয় স্থাপনাকে আমেরিকার অনেকে দেখে সেক্যুলারিজমের লজ্ঘন হিসেবে।

এই বিতর্কে নতুন করে যুক্ত হয় শয়তানের পূজারীরা। ২০১৫ সালের জুলাইতে একটি স্যাইটানিক টেম্পল নামক ধর্মীয় সংগঠন একটি ব্যাফোমেট মূর্তি বানায়। তারা হলো পাক্কা ভোগবাদী।

তাদের কিছু প্রসিদ্ধ স্লোগান হলো,

“সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই”, “পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আদালত মানুষের বিবেক”, “মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক” ইত্যাদি।

এরপর ব্যাফোমেট মূর্তি নিয়ে শয়তানের পূজারিরা হাজির হয় আমেরিকার বিভিন্ন সরকারি ভবনের সামনে। স্বভাবগতভাবেই খৃস্টানরা তীব্র প্রতিবাদ করে ও বাধা দেয় তাদেরকে।

এই সময় অনেক খৃস্টানকে স্লোগান দিতে দেখা যায়, ‘শয়তানের পূজারিদের কোনো অধিকার নেই’।

সেক্যুলারিজম এর ধর্মীয় স্বাধীনতা

সেক্যুলাররা যদিও মুখে বলে, ধর্মের ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তারা তাদের মতাদর্শ, তাদের মতবাদ অন্যান্য ধর্মপ্রাণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চায়।

২০১৭ সালে সুইজারল্যান্ডে একটি ঘটনা ঘটে। বাবা-মা তুর্কি বংশদ্ভূত সুইস নাগরিক।

তাদের সন্তানদের স্কুলের সাঁতার ক্লাসে একত্রে কিশোর-কিশোরীদের সাথে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান।

এর ফলে উক্ত স্কুল সেই বাবা-মাকে ১৬০০ পাউন্ড জরিমানা করে। স্কুল দাবী করে, সাঁতার কালিকুলামের একটি অংশ। তাই সন্তানদের এখানে পাঠানো বাধ্যতামূলক।

কিন্তু এই মুসলিম বাবা-মা হাল ছাড়ার পাত্র নন। তারাও পাল্টা স্কুলের বিরুদ্ধে মামলা করে দেন।

কারণ, মুসলিম ধর্মে ছেলে মেয়ে একত্রে সাঁতার শেখা বৈধ নয়। আর সুইজারল্যান্ড নিজেদের সেক্যুলার দাবী করে।

কিন্তু সুইস আদালত এই মামলা নাকচ করে দেয়। হাল না ছেড়ে বাবা-মা হিউম্যান রাইটস এর কাছে যান। তারাও অপারগতা জানায়।

ইউরোপের আদালত বলে, অভিবাবকের আপত্তি অগ্রহণযোগ্য। আর একত্রে সাঁতার ক্লাসে পাঠাতে বাবা-মা আইনত বাধ্য।

আদালত বলে, যদিও অভিবাবকদের এভাবে বাধ্য করার ফলে ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

কিন্তু এরপরও এতে ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন হচ্ছে না! (বড়ই আশ্চর্যজনক)

আরেকটি ঘটনা ঘটে ২০১৬ সালে জার্মানীতে। সেখানেও একত্রে সাঁতার সংক্রান্ত বিষয়ে এক মুসলিম পরিবার মামলা করে।

তখন জার্মান আদালত বলে, মুসলিম কিশোরীরা ছেলেদের সাথে সাঁতার ক্লাস করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে কোনো ধরণের ছাড় পাওয়ার সুযোগ নেই।

পরবর্তীতে জার্মানীতে আরেক মুসলিম পরিবারকে ৫,০০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হয়।

কারণ হিসেবে বলা হয়, তাদের ছেলে সন্তান স্কুলের মহিলা শিক্ষিকার সাথে হাত মেলাতে রাজী হয় নি।

২০১১ সালে ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে ফ্রান্স নারীদের নিকাব পরিধান করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কারণ হিসেবে তারা বলে,

নিকাব নারীদের দাসত্বের চিহ্ন। আর সেক্যুলার ফ্রান্সে এটির কোনো জায়গা নেই। এরপর যারা জনসম্মুখে নিকাব পরে বের হবে তাদেরকে ১৫০ ইউরো জরিমানা করা হবে।

এমন আরো হাজারো ঘটনা আছে। যেখানে মুসলিম ধর্মের বেলায় তারা ডাবল স্টান্ডার্ড দেখায়। অন্যান্য বেলায় সেক্যুলার সাজে।

ভারতের বাবরি মসজিদের ঘটনা, ফিলিস্তিন-ইসরাইল দ্বন্দ্ব, কুরআনের ব্যাখ্যা করলে ফাঁসি বা জেল, এই সকল কিছুইতেই আমরা সেক্যুলারদের নিজস্ব মুলনীতির অবাধ্য দেখি। এমনটাই হলো সেক্যুলারিজম এর ধর্মীয় স্বাধীনতা এর সুক্ষ্ম ধোঁকা।

তথ্যসুত্র: চিন্তাপরাধ, আসিফ আদনান।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন:কিছু সংখ্যক মানুষ দাবী করে যে, দীনের অনুসরণই মুসলিমদেরকে উন্নতি থেকে পিছিয়ে রেখেছে। তাদের দলীল হলো পাশ্চাত্য দেশসমূহ সকল প্রকার দীনকে প্রত্যাখ্যান করেই বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা এও বলে যে, পাশ্চাত্য বিশ্বেই বেশি করে বৃষ্টি ও ফসলাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই?

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)
উত্তর: দুর্বল ঈমানদার, ঈমানহীন এবং ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরাই কেবল এ ধরণের কথা বলতে পারে। মুসলিম জাতি ইসলামের প্রথম যুগে দীনকে আঁকড়ে ধরেই সম্মান-মর্যাদা এবং শক্তি অর্জন করে পৃথিবীর সকল প্রান্তে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মুসলিমদের স্বর্ণ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহ করেই বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্ব এতো উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মুসলিম জাতি আজ তাদের সঠিক দীনকে ছেড়ে দিয়ে আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদ্‌আতে লিপ্ত হওয়ার কারণেই সমস্ত জাতির পিছনে পড়ে আছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মুসলমানেরা যদি আবার তাদের দীনের দিকে ফিরে যায়, তা হলে আমারই সম্মানিত হবো এবং সমস্ত জাতির উপরে আমরা রাজত্ব করতে সক্ষম হবো। আবু সুফিয়ান যখন রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াসের সামনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের পরিচয় তুলে ধরল, তখন রোমের বাদশা মন্তব্য করে বলল যে, তুমি যা বলছ, তা সত্য হলে অচিরেই তাঁর রাজত্ব আমার পা রাখার স্থান পর্যন্ত চলে আসবে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হয়েছে, আমাদের দীন তা গ্রহণ করতে বাধা দেয় না। আফসোসের কথা হলো মুসলিমগণ দীন-দুনিয়া উভয়টিকেই হারিয়ে ফেলেছে। পার্থিব উন্নতি সাধন করতে ইসলাম কখনো বিরোধীতা করে না। আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ
[الانفال: ٦٠]

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়ার মধ্য থেকে। তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০]

আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦ﴾
[الملك: ١٥]

“তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার দিক-দিগন্তে ও রাস্তাসমূহে চলাফেরা কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক আহার কর।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৫]

তিনি আরো বলেন,

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا
[البقرة: ٢٩]

“তিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্টের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৯]

এ অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা মানুষকে পৃথিবীর সকল বস্তু উপার্জন করে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার প্রতি উৎসাহ যোগায়। দীন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নয় বরং তা দ্বারা পার্থিব জীবনে উপকৃত হওয়ার জন্য। অমুসলিম রাষ্ট্রের লোকেরা মৌলিক দিক থেকে কাফির। দীনের দাবী করে থাকে, তাও বাতিল ধর্ম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ﴾
[ال عمران: ٨٥]

“যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দীন গ্রহণ করবে, তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫] আহলে কিতাবীরা যদিও অন্যান্য কাফির-মুশরিকদের থেকে আলাদা, কিন্তু পরকালে কোনো পার্থক্য হবে না। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করে বলেছেন, এ উম্মতের কোনো ইয়াহূদী-নাসারা যদি তাঁর দাওয়াত শ্রবণ করার পরও ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তারা নিজেদেরকে ইয়াহূদী বলে দাবী করুক বা নাসারা হিসেবে দাবী করুক, সবই সমান।

অমুসলিমরা বৃষ্টিসহ অন্যান্য যে ধরণের নি‘আমতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তার কারণ হলো এটা তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তাদের ভালো কাজের বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করা হয়ে থাকে।

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে দেখে বললেন, হে আল্লাহর নবী! পারস্য এবং রোমের বাদশাহগণ অসংখ্য নি‘আমতের ভিতরে রয়েছে। আর আপনি এ জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন, হে উমার এদেরকে পার্থিব জীবনেই সমস্ত নি‘আমত দেওয়া হয়েছে। তুমি কি এতে রাজী নও যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য হবে আখিরাত।[1]

তাছাড়া তুমি কি দেখ না যে, তাদের মধ্যে হয়ে থাকে অনাবৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্পসহ নানা বিপদাপদ? যা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় এবং রেডিওতে শুনা যায়। উল্লিখিত প্রশ্নের মত যারা প্রশ্ন করে, তারা অন্ধ। আল্লাহ তাদের অন্তরকেও অন্ধ করে দিয়েছেন। যার ফলে তারা বাস্তব অবস্থা দেখতে পায় না। তাদের জন্য আমার নসীহত এ যে, তারা যেন মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবা করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের দিকে ফিরে আসলেই আমাদের জন্য সম্মান, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব অর্জিত হবে। উপরোক্ত সন্দেহ পোষণকারীর এটাও বিশ্বাস করা জরুরি যে, পাশ্চাত্য বিশ্বের কাফিররা বাতিলের ওপর রয়েছে। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পরকালে পূর্ণভাবে শাস্তি প্রদানের নিমিত্তেই তাদেরকে দুনিয়ার নি‘আমত প্রদান করা হয়েছে। যখন তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, তখন তাদের দুঃখ ও হতাশা বেড়ে যাবে। তাদেরকে নি‘আমত প্রদানের উদ্দেশ্য এটিই।[2]

রেফারেন্স:

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল মাযালিম।

[2] আল্লাহর এ বাণীটি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, তিনি বলেন, فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةٗ فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ “যখন ওরা ভুলে গেল ঐ বিষয় যার উপদেশ গ্রহণ করার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা তাদের জন্য সকল কিছুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তা নিয়ে তারা আনন্দ-খুশিতে মত্ত হয়ে পড়ল, তাদেরকে আমরা হঠাৎ পাকড়াও করলাম, তখন তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৪৪]

অমুসলিম দেশে মুসলিম পরিচয় রক্ষা

চাকরি, লেখাপড়া, যুদ্ধ-বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা ও উন্নত জীবন লাভের আশায় মুসলিম দেশ থেকে বহু মুসলিম অমুসলিম দেশে পাড়ি জমায়। তাদের অনেকেই দীর্ঘ মেয়াদে অমুসলিম দেশে বসবাস করে।

আবার কেউ কেউ অমুসলিম দেশের নাগরিকত্বও গ্রহণ করে। অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের সামনে বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো মুসলিম পরিচয় রক্ষা করা।

বিশেষত অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের অনেকেই ইসলাম ও ইসলামী জীবনধারা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, মুসলিম পরিচয় ত্যাগ করছে। যা খুবই উদ্বেগজনক।

মুসলিম পরিচয় বহনের গুরুত্ব

একজন মুসলমানের জন্য মুসলিম পরিচয় বহন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে তা অপরিহার্য।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কোরো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ কোরো না। ’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২)
আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদরা বলেন, তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির জীবনই মুসলমানের জীবন। আর তা হলো জীবনের সর্বত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য। (মাআরেফুল কোরআন : ২/১১০)

পূর্ণ পরিচয় বহন করা আবশ্যক

মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো পরিপূর্ণরূপে ইসলামকে ধারণ করা। আংশিক পরিচয় ধারণ এবং আংশিক ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনরা! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৮)

আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ‘তোমরা একই ধর্মাচার মেনে চলো, পরিপূর্ণ ইসলাম মান্য কোরো এবং তার ওপর দৃঢ় থাকো। ’ (তাফসিরে কুরতুবি : ৩/৩৯২)

পরিবার রক্ষায় চাই বিশেষ পরিকল্পনা

অমুসলিম দেশের ইসলামবিমুখ সমাজে পরিবারের সদস্যদের দ্বিন ও ইসলাম রক্ষায় বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। যেমন পরিবারে দ্বিনচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, শিশুদের প্রয়োজনীয় দ্বিনি শিক্ষা নিশ্চিত করা, পরস্পরকে দ্বিন পালনে উৎসাহিত করা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো, ‘হে মুমিনরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কোরো আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতারা, যারা অমান্য করে না তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই তারা করে। ’ (সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬)

আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা আবশ্যক

ইসলাম মা-বাবা ও অভিভাবককে সন্তান-সন্ততি ও অধীনদের দ্বিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব দিয়েছে। কেউ যদি এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তবে পরকালে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘প্রত্যেক নবজাতক ফিতরতের (ইসলামের) ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাঁকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিউপাসকে পরিণত করে। ’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৮৫)

মুসলিম পরিচয় রক্ষার উপায়

কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম রক্ষার কয়েকটি উপায় বর্ণনা করা হলো। যার মূলকথা হলো, ইসলাম ও মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অন্তরে ধারণ করা এবং হীনমন্যতার শিকার না হওয়া। যেমন—

১. ইসলামই আলো : সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতির জন্য ইসলামই আলো। ইসলাম ছাড়া আলোকিত জীবনযাপন সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে

চায়, এর (কোরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। ' (সুরা মায়িদা, আয়াত : ১৬)

২. ইসলামই পূর্ণাঙ্গ : পৃথিবীতে যত দ্বিন ও ধর্ম আছে তার মধ্যে আল্লাহ ইসলামকেই পূর্ণতা দান করেছেন। তাই ইসলামকেই ধারণ করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বিন মনোনীত করলাম। ' (সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩)

৩. মুসলমানই শ্রেষ্ঠ জাতি : মুমিন অন্তরে এই বিশ্বাস লালন করে যে, মুসলমানই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই মুসলিম পরিচয় ধারণ করা লজ্জার নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজ থেকে নিষেধ কোরো এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করো। ' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)

৪. আল্লাহর আনুগত্য সর্বত্র : মুমিন আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ইসলামের পরিচয় ধারণ করে। আল্লাহর আনুগত্য দেশে ও প্রবাসে সর্বত্র আবশ্যক। মহানবী (সা.) বলেন, 'তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তাআলাকে ভয় কোরো, মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কোরো, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কোরো। ' (জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৯৮৭)

৫. দৃঢ়তাই সাফল্য : প্রতিকূল পরিবেশে ঈমান ও ইসলামকে আঁকড়ে ধরা এবং তার ওপর দৃঢ় থাকাই সাফল্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এই কোরআন পথদেখায় সেই পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার। ' (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৯)

৬. সুপথে চলার সুফল নিজের : সুপথে চলতে কষ্ট হলেও এর সুফল ব্যক্তি নিজেই ভোগ করবে। ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বোলো, আমি তো কেবল সতর্ককারীদের জন্য একজন। ' (সুরা নামল, আয়াত : ৯২)

৭. পরকালই প্রকৃত ঠিকানা : মুমিনের প্রকৃত ঠিকানা পরকাল। তাই সে পার্থিব স্বার্থের জন্য পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। আল্লাহ বলেন, ‘কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখেরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী। ’ (সুরা আলা, আয়াত : ১৬-১৭)

পরিচয় ত্যাগের ক্ষতি

কোরআন ও হাদিসের একাধিক স্থানে মুসলিম পরিচয় ত্যাগ করার ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। ’ (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪০৩১)
অন্য হাদিসে নবীজি (সা.) বলেন, ‘দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন কোরো, আর ইহুদিদের অনুকরণ কোরো না। ’ (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫০৭৩)

মনে রাখতে হবে, কোনো অমুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলাম ও ইসলামের পরিচয় ত্যাগের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। কেননা তারা মুসলিমদের ঈমানহারা না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না। পবিত্র এই বাস্তবতায় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ কতই না চমৎকার বলেছেন, ‘ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তোমরা প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো। বোলো, আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। ’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১২০)

আল্লাহ সবাইকে স্বদেশে ও প্রবাসে ঈমান-ইসলাম রক্ষা করে চলার তাওফিক দিন,আমিন।

উপসংহার

ইসলাম একটা দ্বীন, পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থাপনা। ইসলাম একটা worldview দাবি করে। ইসলাম দাবি করে যে, আপনি দুনিয়াকে ইসলামের চশমায় দেখবেন। ইসলাম একটা সুতন্ত্র weltanschauung, বস্তুবাদকে সামনে নিয়ে আপনি সারা দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ঢেলে সাজাতে পারবেন। পুঁজিবাদ সামনে নিয়ে আপনি ব্যক্তি-সমাজ-জ্ঞান-অর্থ-রাষ্ট্র সবকিছু ঢেলে সংজ্ঞা দিতে পারবেন (এখন যা হচ্ছে আরকি)। ইসলাম সেরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ টোটালি কমপ্লিট

আলাদা এক worldview. যা নির্ভর করে আধ্যাত্মিকতা ও পারলৌকিক সাফল্যের ওপর। ইসলাম সবকিছুর আলাদা সংজ্ঞা দেয়। এই বিশ্বচরাচরের প্রতিটা জিনিসের, প্রতিটা চিন্তার। স্বাধীনতা- সমতা-সহাবস্থান-উদারতা-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-শিক্ষা-উন্নতি-প্রগতি-শিল্প-সংস্কৃতি-পুঁজি-অর্থ-সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যক্তি-পরিবার-নৈতিকতা। আলাদা কনসেপ্ট দেয়, আলাদা উদ্দেশ্য দেয়। আলাদা চরিত্র দেয়। আলাদা পিকচার দেয়।

মাওলানা আব্দুর রহিম রাহিমাহুল্লাহ তার পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি বইয়ে একটা কথা লিখেছেন: অধিকাংশ মানুষের কোনো দর্শন নাই। এইটাই সেক্যুলারিজম। কোনো দর্শন না থাকা।' পাশ্চাত্য শিক্ষা মুসলিমদেরকে দর্শনহীন উদ্দেশ্যহীন মিশন-হীন করে দিয়েছে। ৯০% মুসলিমকে আপনি দেখবেন বেসিক নিডের জন্য ২৪ ঘণ্টা কাটাচ্ছে। যাদের বেসিক নিড পুরা হয়ে গেছে, তারা আত্ম-প্রসাদকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। আয়-ভোগ-আরো ভোগ... এটাই তাদের worldview.

শাইখ আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহ এজন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলেছেন 'নয়া ইরতিদাদ' (নব্য দ্বীনত্যাগ)। কারণ তা ইসলামের ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা দেয়, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

পাশ্চাত্যের অনুকরণ এবং এর ভাবাদর্শকে আপন করে নেওয়ার ফলে, ইসলামি বিশ্ব তার অতীত থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। যারা ফলে তার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার মূলে পচন ধরতে শুরু করেছে। তার অবস্থা যেন ওই গাছের মতন, যার শেকড় মাটির গভীরে থাকা অবস্থায় সে জোরদার ছিল। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার পাহাড়ি জলস্রোত এসে শেকড়কে আলগা করে দিয়েছে। ফলে পুষ্টির অভাবে ধীরে ধীরে গাছটি নেতিয়ে পড়ছে। এক-এক করে ঝরে পড়ছে তার পত্রগুচ্ছ। ডালপালা শুষ্ক হয়ে আসছে। দিনশেষে এর গুড়ি উপড়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

প্রত্যেক মুসলিমের একটা চশমা থাকার কথা, যার ভেতর দিয়ে তার দুনিয়া দেখার কথা। বর্তমানে সে যেভাবে চলছে, এভাবে চললে তার দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে আসবে। আর তার সংকীর্ণ দুনিয়া শেষে ভয়াবহ পরকাল। দুপাড়ই শেষ। পাশ্চাত্য সভ্যতা তার জালিম দর্শন দিয়ে চুষে-ছিবড়ে-নিঙড়ে শেষ করে নেয় একেকজন মানুষকে। দুনিয়াও, আখিরাতও।

আমরা মানুষ এবং মুসলিম। টেস্টোস্টেরোন থেকে উৎসারিত আত্মপ্রসাদ ও প্রতিপত্তির চাহিদা আমাদের মিশন নয়। ওটা তো স্বাভাবিক জান্তব প্রক্রিয়া। মিশন হলো এমন কিছু, যা আমার দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাইরে। আমার নিজ দেহজ চাহিদা ছাড়া মানসিক তাড়না থেকে

যা আমরা করি, সেটা আমার মিশন। মুসলিম হিসেবে 'আমি মরার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাবো' এমন কিছুও আমার নিঃস্বার্থ অতিরিক্ত এই পার্থিব শ্রমের বিষয় হতে পারে না। হয়তো আমার কথা ধরতে পেরেছেন। প্রতিটি মুসলিমের চিরস্থায়ী মিশন থাকা উচিত, যার ফল শেষ হবে না, যেহেতু আমরাও শেষ হব না। এমন কিছু মিশন হওয়া উচিত, যার সুফল মৃত্যুর পরেও আমাকে উপকার পৌঁছাতে থাকবে। আর সেটা হলো, ইসলামের বিজয়ের জন্য কিছু না কিছু করা।

মানবতার সবচেয়ে বড় সেবা এখন তাকে ইসলামের চশমার খোঁজ দেওয়া। ভাই, তোমার এই অসহনীয় জীবন থেকে বাঁচাতে পারে কেবল ইসলাম। ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউ দিয়ে দুনিয়া দেখো, দেখো কত সুন্দর জীবন। পালকের মতো হালকা, নদীর বাতাসের মতো ঝিরঝিরে, মেনথলের মতো সতেজ। আপনার দুনিয়াপরস্ত আত্মীয়, সেক্যুলার বন্ধু, ঘরপোড়া হিন্দু, আত্মহত্যা-সেতুর রেলিংয়ে দাঁড়ানো জাপানি, নিজের গায়ে আগুন দেওয়া ভারতীয়-মেক্সিকান কৃষক কিংবা তিউনিসিয়ার সবজি-বিক্রেতা, আমেরিকার ঝলমলে ক্যাসিনোয় বিক্রি হয়ে যাওয়া ল্যাটিনো কিশোরী, ধুঁকতে থাকা মাদকাসক্ত ছেলেটা কিংবা এইডস-আক্রান্ত বতসোয়ানার প্রসূতিটা। ইসলামের অভাবে এই প্রতিটা মানবসত্তা ভুগছে, আর হয়ে যাচ্ছে স্রেফ কয়েকটা সংখ্যা (এত জন, অত জন, ব্যস)। ভাই দাওয়াহকে মিশন হিসেবে নেন। এর চেয়ে বড় কোনো উপকার নেই মানবতার জন্য। মানুষকে পণ্যের মর্যাদা থেকে, স্রেফ ভোক্তা-বাজারের মর্যাদা থেকে, কয়েকটা সংখ্যার মর্যাদা থেকে মানুষের মানবীয় সম্মানের খোঁজ দেওয়ার চেয়ে বড় আর কোনো সেবা নেই।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কোরআনে বলেন—-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
[آل عمران: 110]

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। [সূরা আলে-ইমরান: 110]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন–

هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
[الرحمن: 60]

সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? [সূরা আর-রহমান: 60]

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অমুসলিম দেশে মুসলমান- মুফতি আখতার ইমাম আদিল কাসিমি
দাওয়াত সম্পর্কিত চল্লিশ হাদিস- মুফতি যুবায়ের আহমদ
সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ- মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত- মুহাম্মদ আসাদ
আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা- মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
অবাধ্যতার ইতিহাস- ডা.শামসুল আরেফীন
বিভিন্ন ওয়েবসাইট- আইফতোয়া (আইওএম), মাসিক আল কাউছার, মুসলিম বাংলা ফাতওয়া বিভাগ, হাদিস বিডি ও অন্যান্য।